BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

স্বপ্নদ্বীপ

২২শে মার্চ

অনেকে বলেন যে, স্বপ্নে নাকি আমরা সাদা আর কালো ছাড়া অন্য কোনও রং দেখি না। আমার বিশ্বাস আসল ব্যাপারটা এই যে, বেশিরভাগ সময় স্বপ্নের ঘটনাটাই কেবল আমাদের মনে থাকে ; রং দেখেছি কি না দেখেছি, সেটা আমরা খেয়ালই করি না ! মোট কথা, কাল রাত্রে আমি এমন একটা ঝলমলে রঙিন স্বপ্ন দেখেছি যে সেটার কথা না লিখে পারছি না।

দেখলাম আমি একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে ঘরবাড়ি লোকজন কিছুই নেই—আছে শুধু গাছপালা আর বনজঙ্গল। এইসব গাছপালার একটিও আমার চেনা নয়। এদের রংও ভারী অস্বাভাবিক। সবুজ পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। তার বদলে নীল লাল বেগুনি কমলা এই ধরনের রং। গাছে ফুল আর ফলও আছে—তার একটাও আমার চেনা নয়। একটা প্রকাণ্ড ফুলে অজস্র পাপড়ি আর প্রত্যেকটা পাপড়ির রং আলাদা। আর একটা ফুলের এক-একটা পাপড়ি যেন এক-একটা হাতির কান, আর হাতির কানের মতোই সেগুলো মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। ফলও যে কত রকমের রয়েছে, তার ঠিক নেই। একটা প্রকাণ্ড গাছে সরু সরু নীল রঙের ফল বটগাছের শিকড়ের মতো মাটিতে গিয়ে নেমেছে। আর একটা তরমুজের সাইজের ফল—তার সর্বাঙ্গে গাঢ় লাল রোঁয়া, আর সেই রোঁয়ার ভিতর দুটো করে গোল গোল সাদার মাঝখানে কালো ফুটকি। ঠিক যেন মনে হয়, ফলের গায়ে একজোড়া চোখ।

স্বপ্নটা এতই জলজ্যান্ত যে, মনে হচ্ছিল এ রকম একটা জায়গা সত্যিই আছে, আর আমি যেন সত্যিই সেখানে গেছি। আর রঙের কথাটাও ভুলতে পারছি না। স্বপ্নটা দেখা অবধি বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে ইচ্ছা করছে। বিশেষ করে এমন কোনও জায়গায়, যেখানে রঙিন গাছপালা ফুল-ফলের প্রাচুর্য। গিরিডিতে বছরের এই সময়টা রঙের বড় অভাব। যাক গে—এখন স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবে আসা যাক।

আমার অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি নিয়ে গবেষণা বেশ আশাপ্রদ ভাবে এগোচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটা ধাতু তৈরি করা, যেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। অর্থাৎ—সে-ধাতুর কোনও ওজন থাকবে না। তাকে শূন্যে ছেড়ে দিলে সে শূন্যেই থেকে যাবে। এই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর সাহায্যে একটা ছোটখাটো উড়োজাহাজ তৈরি করতে পারলে খুব সহজেই এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসা যাবে।

আশ্চর্য এই যে সবচেয়ে ওজন বেশি যে ধাতুর—অর্থাৎ পারা বা mercury—সেটি ছাড়া এই ওজনবিহীন নতুন ধাতুটি তৈরি করা যাবে না, এটা আগে বুঝতে পারিনি। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, হ্যাকেনবুশের গবেষণা এই পারার অভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। পারা জোগাড় হয়েছে। তা ছাড়া তামার গুঁড়ো, ষাঁড়ের খুর, চক্‌মকি পাথর ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ হয়েছে। আজ থেকে দ্বিগুণ

www.BDeBooks.Com

উৎসাহে কাজে লেগে পড়তে হবে। বর্ষা নামার বেশ কিছু আগেই আমার আকাশযানটি তৈরি করে ফেলতে হবে ; কারণ মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করতে পারলেও, ঝড়ঝঞ্ঝার দাপট একটা সামান্য উড়োজাহাজ সহ্য করবে কী করে ?

২৫শে মার্চ

আমার তৈরি অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর কী নাম দেওয়া যায়, তাই ভাবছি। গবেষণা যে সফল হয়েছে, সেটা বলাই বাহুল্য। পাঁচ বছর বয়সে প্রথম যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রকাশ পায়, তখন থেকে আজ অবধি আমি কোনও গবেষণায় ব্যর্থ হইনি। এখনও মনে আছে, আমার সেই পাঁচ বছর বয়সের ঘটনাটা। খাটে বসে আমার বন্ধু ভুতোর সঙ্গে টিড্‌লি উইংক্‌স খেলছিলাম। সে-খেলা আজকাল আর কেউ খেলে কি ? সিকির সাইজের রং-বেরঙের সেলুলয়েডের চাকতির কিনারে আরেকটা বড় সাইজের চাকতি দিয়ে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেই সেগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে এগিয়ে যেত। সামনে একটা কৌটো রাখা থাকত। উদ্দেশ্য ছিল ছোট চাকতিগুলোকে এই ভাবে চাপ দিয়ে লাফ খাইয়ে কৌটোর মধ্যে ফেলা। সেদিন ভুতোর সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ চাকতি লাফানোর বৈজ্ঞানিক কারণটা মাথায় এসে গেল, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেললাম, ঠিক কোনখানটায় কতখানি জোরে চাপ দিলে চাকতি বাইরে না পড়ে ঠিক কৌটোর মধ্যে গিয়ে পড়বে। তারপর থেকে আর কি ভুতো আমার সঙ্গে পারে ? বাবা পাশে বসেছিলেন। আমার খেলা দেখে চোখ গোল গোল করে বললেন, 'তিলু, তোর হল কী ! এ যে একেবারে ভেলকি দেখিয়ে দিচ্ছিস তুই !...'

তেরো বছর বয়সে আমার মাথায় প্রথম পাকা চুল দেখা দেয়। সতেরো বছরে টাক পড়তে শুরু করে। একুশে পড়তে না পড়তে আমার মাথা-জোড়া টাক—কেবল কানের দুপাশে, ঘাড়ের কাছটায় আর ব্রহ্মতালুর জায়গায় সামান্য কয়েকগাছা পাকা চুল। অর্থাৎ আজও আমার যা চেহারা, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও ছিল ঠিক তাই।

ধাতুটার নাম শ্যাঙ্কোভাইট দেওয়া স্থির করলাম। আজ আমার বেড়াল নিউটনের চার থাবায় চার টুকরো শাঙ্কোভাইটের পাত বেঁধে দিয়ে তাকে মাথার উপর তুলে ছেড়ে দিতেই সে বেলুনের মতো ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল। আশ্চর্য দৃশ্য এবং আশ্চর্য আনন্দ। শুধু আমার আনন্দ নয়, নিউটনেরও। মাটিতে নেমেই সে দিব্যি টেনিস বলের মতো 'হপ্‌' করতে করতে আমার পায়ের কাছে এসে আমার পাৎলুনে গা ঘষতে লাগল।

আমার আকাশযানের নাম দেব শ্যাঙ্কোপ্লেন। প্লেনে একটা প্রপেলার অবশ্যই থাকবে, এবং তাতেই শূন্যে উঠে সামনের দিকে এগোনোর কাজটা হয়ে যাবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর একটু আগে হিসেব করে প্রপেলারটা থামিয়ে দিলেই প্লেন ধীরে ধীরে ঠিক জায়গায় গিয়ে নামবে।

ভাল কথা—গত তিনরাত পর পর আবার সেই রঙিন জায়গার স্বপ্ন দেখেছি। প্রতিবারই জায়গাটা সম্পর্কে কিছু কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। যেমন, সেদিন দেখলাম গাছপালা ভেদ করে পিছন দিকে সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে। একটা নামও স্বপ্নের মধ্যে কে যেন বার বার আমার কানের কাছে বলতে লাগল... 'ফ্লোরোনা...ফ্লোরোনা...ফ্লোরোনা...'

বার বার মনে প্রশ্ন জাগছে—এমন জায়গা কি সত্যিই আছে ? স্বপ্ন সত্যি না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাও বলব—থাকলে বড় ভাল হত। কিন্তু কোথায় ? কোন গ্রহে আছে এমন জায়গা ? পৃথিবীতে তো এমন অদ্ভুত গাছপালার কথা কেউ জানে না, শোনেনি।

২৬শে মার্চ

অদ্ভুত ব্যাপার ! কাল রাত্রেও সেই একই জায়গার স্বপ্ন। এবার আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্য জানা গেল। এই সব রংচঙে গাছপালার মধ্যে একটির গুঁড়িতে একটি গর্ত—যেমন অনেক বুড়ো বট-অশ্বত্থের গায়ে থাকে। সেই গর্ত দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর গলার স্বরে কে যেন বলে চলেছে ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিচিউড ওয়ান থার্টি-সিক্স ইস্ট...ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিচিউড ওয়ান-থার্টি-সিক্স ইস্ট...। দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের এই হিসেবে যে জায়গাটা বেরোয়, সেটা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পড়ে। ম্যাপে দেখলাম, সেখানে নীল রং ছাড়া আর কিচ্ছুই নেই। অর্থাৎ ডাঙার কোনও চিহ্নই নেই। এটা আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ম্যাপে দেখানো কোনও জায়গায় এ সব গাছপালা থাকতেই পারে না।

পাঁচদিন পর পর একই স্বপ্ন দেখার ফলে জায়গাটাতে যাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটা সম্ভবত-কাল্পনিক জায়গার প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ মোটেই বৈজ্ঞানিকের লক্ষণ নয়, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু কী আর করি ? ডায়রিতে তো মনের আসল ভাবটা প্রকাশ করতে হয় !

আজ আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এসেছিলেন। শ্যাঙ্কোভাইট নিয়ে অবিনাশবাবুকে একটু চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল। পাশেই টেবিলের উপর থেকে একটা টুকরো নিয়ে ভদ্রলোকের নাকের সামনে শূন্যে ছেড়ে দিতে সেটা সেখানেই রয়ে গেল।

ভদ্রলোক মিনিটখানেক সেটার দিকে চেয়ে থেকে বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে বললেন, 'দিব্যি উড়ে রয়েছে, অথচ ডানার ভন্‌ভনানি তো শুনতে পাচ্ছি না ! কী পোকা মশাই !'

ভদ্রলোক আমার এত পরিশ্রমের এত সাধের আবিষ্কারটিকে এককথায় পোকার পর্যায়ে ফেলে দেবেন, তা ভাবতে পারিনি। অবশ্য ওঁর মতো অবৈজ্ঞানিকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক এবার শূন্যে ভাসমান চাকতিটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আজকের কাগজে খবর দেখেছেন ?'

'কী খবর ?'—আমি যখন গবেষণায় ব্যস্ত থাকি, তখন অনেকসময় খবরের কাগজ দেখার আর সুযোগ হয় না। অবিনাশবাবু পকেটে হাত দিয়ে একটা বাংলা কাগজের ছেঁড়া অংশ বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খবরটা পড়ে আমি রীতিমতো বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠলাম।

ইউরোপের সাতজন স্বনামধন্য মনীষী একজোটে উধাও হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর সিড্‌নি হ্যামলিন ও জাপানের দার্শনিক হামুচি হামাদাকে আমি চিনি। অন্য পাঁচজন হচ্ছেন ইতালির গণিতবিশারদ উমবের্তো কারবোনি, জার্মানির বায়োকেমিস্ট ডক্টর আডল্‌ফ ব্রোডেন, সুইডেনের ভূতত্ত্ববিদ ওলসেন বোর্গ, ফ্রান্সের মনস্তত্ত্ববিদ আঁরি ভিল্‌মো আর রুশ ভাষাবিদ ভ্লাদিমির তুশেঙ্কো। এঁরা সকলেই ফিলিপিনের রাজধানী ম্যানিলা শহরে একটা আন্তর্জাতিক মনীষী সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। আমারও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু শ্যাঙ্কোভাইটের কাজটা ফেলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সাতজনেই একদিনে একই সময়ে অদৃশ্য হয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে ম্যানিলার সমুদ্রতীর থেকে একটি স্টিমলঞ্চও অদৃশ্য হয়েছে। খবরে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, এই সব মনীষীদের হয়তো কোনও দুর্বৃত্তের দল কোনও অজ্ঞাত কারণে 'কিডন্যাপ' করেছে।

খবরটা মোটেই ভাল নয়। অবিনাশবাবু বললেন, 'কদ্দিন বলিচি, বাড়ির বাইরে একটা পাহারার বন্দোবস্ত করুন। নিমু হালদারকে বললেই বারো মাসের জন্য একটা পুলিশ

www.BDeBooks.Com

মোতায়েন করে দেবেন ফটকের সামনে। অতি সাহস মূর্খের লক্ষণ—এ প্রবাদটা বোধ হয় জানা নেই আপনার...'

আমি অবিশ্যি আশাবাদী মানুষ ; কিংবা স্বপ্ন আর শ্যাঙ্কোভাইট মিলিয়ে আমার মনের অবস্থাটা হয়তো একটু অতিমাত্রায় হালকা ছিল, তাই বললুম, 'ও সব কিডন্যাপিং ট্যাপিং সব রং চড়ানো গল্প। আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকেরা নিজেরাই উদ্যোগ করে সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়েছেন—দু' একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

মুখে যাই বলি, মনের মধ্যে একটা খচখচানি রয়ে গেল। শ্যাঙ্কোপ্লেনের জন্য জোগাড়যন্ত্র করতে করতে বার বার হ্যামলিন ও হামাদার কথা মনে পড়ছিল।

২রা এপ্রিল

পরশু সকালে আমরা গিরিডি থেকে রওনা হয়েছি। 'আমরা' বলছি, কারণ অবিনাশবাবু আমার সঙ্গ ছাড়লেন না। আফ্রিকার অভিজ্ঞতার পর ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতাবোধও রয়েছে ; তাই তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করে পারলাম না। বললেন, 'এমনিতে এরোপ্লেন চড়ার কোনও সখ নেই আমার, তবে আপনি যখন বলছেন যে আপনার এ-যন্ত্রটি ক্র্যাশ করবে না, তখন যেখানেই যেতে চান চলুন, আমি সঙ্গে আছি। তবে কোথায় যাচ্ছেন, সেটাও তো একবার জানা দরকার। তিব্বত টিব্বত নাকি ?'

আমি একটু রসিকতা করেই বললাম, 'ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ—লঙ্গিচিউড ওয়ান থার্টি-সিক্স ইস্ট।'

তাতে ভদ্রলোক বললেন, 'ও সব ল্যাটাচি-লঙাচি রাখুন মশাই—আপনার ব্যাঙাচির মধ্যে আমার অ্যাটাচির জায়গাটা হবে কি না সেইটে বলুন। আপনার মতো এক কাপড়ে বেশিদিন চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।'

আমার প্লেনের সাইজ লম্বায় সাড়ে আট ফুট আর চওড়ায় তিন ফুট। লেজ আছে, ডানা নেই। ওঠা-নামার জন্য দুদিকে দুটো কান্‌কোর মতো জিনিস আছে। প্রপেলার অবশ্যই আছে, আর মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য ব্যবস্থা আছে। বসার আসন হবে বলে আমার বাড়িরই দুটো পুরনো কৌচের মখমলের সিট খুলে প্লেনের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। প্লেনের অবস্থান উচ্চতা গতিবেগ ইত্যাদি নির্ণয় করার জন্যেও যন্ত্রপাতি অবশ্যই আছে।

খাওয়ার ব্যাপারটা সহজ করে নিয়েছি। দুটো বয়ামে দুমাসের মতো 'বটিকা ইন্ডিকা' নিয়েছি—এক বড়িতেই সারাদিনের জন্য পেট ভরে যাবে। তেষ্টা মেটানোর জন্য 'তৃষ্ণাশক' বড়ি আছে, আর আছে টি-পিল্‌স আর কফি-পিল্‌স। আমার জন্য শুধু কফি-পিল্‌স হলেই চলত, কিন্তু অবিনাশবাবুর আবার দিনে তিন বার চা না হলে চলে না। এ ছাড়া আর যে ক'টা জিনিস আছে, সেগুলো বাইরে গেলেই আমি সঙ্গে নিই—আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল, আমার অম্‌নিস্কোপ, আমার ছবি তোলার ক্যামেরাপিড যন্ত্র। প্রপেলার ইঞ্জিনের জন্য রসদ হিসেবে নিয়েছি দুটিন টার্বোলিন। তার মানে পঞ্চাশ হাজার মাইলের জন্য নিশ্চিন্ত। আমার তৈরি এই তেলের গন্ধ ঠিক চন্দন কাঠের মতো। অর্থাৎ আমার সঙ্গে যা কিছু নিয়েছি তা সবই আমারই গবেষণাগারে তৈরি—এভিরিথিং মেড বাই শঙ্কু—এক আমার সহযাত্রী অবিনাশ মজুমদার ছাড়া।

প্লেনের গতি এখন ২০০ মাইল পার আওয়ার, উচ্চতা ২৫০০ ফুট। এই দুদিনে আমরা প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল এসেছি। যে রাস্তায় যাব ঠিক করেছিলাম, সেই রাস্তাতেই চলেছি। বঙ্গোপসাগরে পড়ে পুব-দক্ষিণে চলেছি সুমাত্রার দিকে। সুমাত্রা পৌঁছে সেখান

থেকে পুবে ঘুরে বোর্নিওর উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ব প্রশান্ত মহাসাগরে। তারপর ডাঙা এড়িয়ে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে উত্তর-পুবে আমাদের লক্ষ্যস্থল ল্যাটিচিউড ষোলো নর্থ ও লঙ্গিচিউড একশো ছত্রিশ ইস্টের দিকে ধাওয়া করব। যদি আকাশ থেকে বুঝি সেখানে কিছু আছে, তবে সেখানে গিয়েই নামব ; না থাকলে উলটোপথে ঘুরে এসে দু-একটা মনোরম জায়গা বেছে নিয়ে দু-একদিন করে থেকে হাওয়া বদল করে আবার দেশে ফিরে আসব।

এই কিছুক্ষণ আগে আমরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেরোলাম। নিকোবরের উপর দিয়ে যাবার সময় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে আর কিছুটা কৌতূহলবশত প্লেনটাকে একটু বেশি নীচে নামিয়ে ফেলেছিলাম। নারকেল গাছের পাতাগুলো প্রায় ছোঁয়া যায় বলে মনে হচ্ছিল। এমন সময় অবিনাশবাবু হঠাৎ একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন। ফিরে দেখি, তাঁর হাতের আস্তিনের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গিয়ে হাওয়ায় পৎ পৎ করছে, আর মুখটা হয়ে গেছে কাগজের মতো ফ্যাকাশে। কী ব্যাপার !

অবিনাশবাবু ঘাড় কাত করে নীচের দিকে ইঙ্গিত করলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনটে তির সাঁই সাঁই করে আমার প্লেনের পাশ দিয়ে চলে গেল আকাশের দিকে।

বোতাম টিপে তৎক্ষণাৎ প্লেনটাকে উপর দিকে ওঠাতে ওঠাতে দেখলাম নীচে এক পাল কালো বেঁটে লোক, তাদের হাতে তির-ধনুক, গায়ে উলকি, কানে মাকড়ি আর পরনে কিছু নেই বললেই চলে। তিনশো ফুট উপরে উঠে তবে নিকোবরের বন্য আদিবাসীদের মারাত্মক আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

এ ছাড়া আরও একটা ঘটনা ঘটেছে আরও আগে—সেটার কথাও এই ফাঁকে বলে রাখি।

কলকাতার দক্ষিণে পোর্ট ক্যানিং পেরোবার কিছু পরেই একপাল শকুনি আমাদের সঙ্গ নিল। তখন আমরা আছি প্রায় পাঁচশো ফুট হাইটে। ইচ্ছে করলেই স্পিড বা হাইট বাড়িয়ে শকুনির সঙ্গ ত্যাগ করতে পারতাম, এবং অবিনাশবাবুরও ইচ্ছে ছিল সেটাই, কিন্তু আমার কৌতূহল ছিল শকুনিগুলো কোথায় গিয়ে নামে সেটা দেখব।

সুন্দরবনের উপর দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন সব ক'টা শকুনি হঠাৎ একসঙ্গে নীচের দিকে গোঁৎ খেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাকে নীচে নামাতে শুরু করলাম। পাঁচশো ফুট থেকে ক্রমে চারশো তিনশো দুশো করে নেমে শেষে এমন হাইটে পৌঁছোলাম যেখানে গাছের পাতার মধ্যে পাখির বাসায় ডিম পর্যন্ত দেখা যায়।

শকুনিগুলো চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বনের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে নামল। প্লেনের প্রপেলার বন্ধ করে ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে নেমে বুঝলাম কীসের লোভে শকুনিরা এখানে নেমেছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটি বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাশেই বোধ হয় কোনও গ্রাম থেকে একটা আস্ত গোরুকে ঘায়েল করে টেনে নিয়ে এসেছে নিরিবিলিতে তাকে ভক্ষণ করবে বলে।

অবিনাশবাবু আমার কোটের কলারটা পিছন দিক থেকে খামচে ধরলেন। বাঘটাও দেখলাম আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে একদৃষ্টে আমাদের প্লেনটাকে দেখতে লাগল। শকুনিগুলো আশেপাশের গাছের মগডালে গিয়ে বসেছে—বাঘ যদি কিছু অবশিষ্ট রাখে, তাই দিয়েই হবে তাদের ভোজ।

আমার প্লেন এখন চল্লিশ ফুট হাইটে। সামনে একশো হাতের মধ্যে বাঘ। এবার প্লেনের শব্দ ছাপিয়ে তার গর্জন শুনতে পেলাম।

আমি আর অপেক্ষা না করে পকেট থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে বাঘের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিলাম। পরমুহূর্তেই দেখা গেল যেখানে বাঘ ছিল সেখানে একটা

www.BDeBooks.Com

ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর তার পরে তাও নেই।

এখন আমরা যেখান দিয়ে উড়ছি, তার চারদিকে—এই আড়াই হাজার ফুট থেকেও—যত দূর চোখ যায়, জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

চমৎকার উড়ছে আমার শ্যাঙ্কোপ্লেন। ঝাঁকানি নেই একটুও, তাই লিখতে কোনওই অসুবিধা হচ্ছে না। প্রপেলারের আওয়াজের জন্যই বোধ হয় অবিনাশবাবুর কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে তাঁর খুব একটা আপশোস হচ্ছে বলে মনে হয় না। গিরিডিতে ভদ্রলোক এক মিনিটও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। এখানে বাধ্য হয়ে মৌনতা অবলম্বন করেও দেখছি তাঁর ঠোঁটের কোণে একটা হাসি লেগেই আছে। বার দুয়েক ভদ্রলোককে ঘুমিয়েও পড়তে দেখেছি, তবে কোনওবারই বেশিক্ষণের জন্য নয়।

সত্যি বলতে কী, আমার একটা কথা শুনেই বোধ হয় ভদ্রলোক ঘুমের মাত্রাটা কমিয়ে দিয়েছেন। পরশু সকালে প্লেনে ওঠার কিছুক্ষণ আগে কথাচ্ছলে ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন যে একজন সাধারণ মানুষ তার জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমিয়েই কাটায় ?'

ভদ্রলোক আমার কোনও কথা অবিশ্বাস করলেই খিক্ খিক্ করে হেসে এদিক ওদিক মাথা নাড়াতে থাকেন। তখনও সেটাই করে বললেন, 'মশাই, এ সব ছেলে-ভুলোনো আজগুবি কথা আপনি আপনার চাকর পেল্লাদকে বলুন, আমাকে বলবেন না।' কী মুশকিল ! আমি বললাম, 'আপনি রাত্রে কখন ঘুমোন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এই ধরুন দশটা কি সাড়ে দশটা।'

'আর ওঠেন ?'

'ঘড়ি ধরে ছ'টা।'

'তার মানে ক' ঘণ্টা ঘুমোনো হল ?'

'এই সেরেছে—হিসেব করতে হবে ?' বলে অবিনাশবাবু ভুরু কুঁচকে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললেন, 'প্রায় আট ঘণ্টা।'

'ক'ঘণ্টায় এক দিন হয় ?'

'আবার প্রশ্ন ? দাঁড়ান—চব্বিশ তো। চব্বিশ না ?'

'চব্বিশ। তিন আষ্টে চব্বিশ। তার মানে একদিনের তিনভাগের একভাগ সময় আপনি ঘুমোন—তাই তো ?'

ভদ্রলোক এবার যেন এক পলকে হিসাবটা বুঝে নিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'সময়ের কী ওয়েস্ট বলুন তো। তিনভাগের একভাগ জীবন স্রেফ ঘুমিয়ে নষ্ট করা !'

আসলে ঘুমের প্রসঙ্গ তুলে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা এই—আমি নিজে যেটুকু সামান্য সময় প্লেনে ঘুমিয়েছি, তার মধ্যেও আমার দ্বীপের স্বপ্ন দেখেছি—ফ্লোরোনা দ্বীপ—যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল বিচিত্র রকমের না-দেখা না-জানা গাছপালা আর ফুলফল।

৪ঠা এপ্রিল

কাল বিকেলে আমরা বোর্নিও ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছি। সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে প্লেন নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলাম। অবিনাশবাবু নামবার মিনিটখানেকের মধ্যেই হাতের কাছে একটা কলাগাছ থেকে একছড়া কলা ছিঁড়ে নিয়ে, তার মধ্যে একটার খোসা ছাড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন।

সুমাত্রার ঠিক মাঝখান দিয়ে বিষুবরেখা চলে গেছে। এখানকার গাছপালার সঙ্গে আমাদের দেশের আশ্চর্য মিল। কাছেই জঙ্গলের মধ্যে পেঁপে, বাঁশ, নারকেল ইত্যাদি চোখে পড়ছে। এতদূর পথ এসে দেশের সঙ্গে এত মিল পাওয়ায় ভারী অদ্ভুত লাগছিল।

অবিনাশবাবু দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে কলা খেতে খেতে গাছপালার পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে একটা বিকট শব্দ বেরোল। চেয়ে দেখি ভদ্রলোকের হাত থেকে কলার ছড়া মাটিতে পড়ে গেছে, তিনি হাত দুটোকে পিছিয়ে নিয়ে ঘাড় গোঁজ করে চোখ বড় বড় করে একটা গাছের দিকে চেয়ে আছেন। কী দেখলেন ভদ্রলোক ?

আমি ব্যস্তভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক **তাঁর সামনের** গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'ওটা আবার কী মশাই ?'

যা দেখলাম তাতে আমি যেমন অবাক তেমনি খুশি। গাছের নীচের দিকের একটা ডালে বসে আছে একটা প্রাণী, সেটা জাতে বাঁদর হলেও সেরকম বাঁদর সচরাচর দেখা যায় না। এ বাঁদর সুমাত্রার অধিবাসী। সাইজে **একটা বেড়ালের বাচ্চার মতো**—চোখ দুটো মুখের অনুপাতে আশ্চর্য রকম বড়, হাত পা সরু সরু, আর সেগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করে তাতে মনে হয় বাঁদরটা হয় ভারী নিস্তেজ, না হয় অত্যন্ত কুঁড়ে। আসলে কিন্তু এ-বাঁদর স্বভাবতই ওরকম ঢিমে, আর তাই এর নাম হল 'স্লো লরিস'।

অবিনাশবাবুর অবাক ভাব এখনও কাটেনি। আমি বাঁদরটার কাছে গিয়ে হাত বাড়াতেই সেটা ডাল থেকে আমার হাতের কবজির উপর চলে এল। অবিশ্যি এই সামান্য ঘটনাটা ঘটতে লাগল প্রায় দু'মিনিট। স্থির করলাম যে এই নিরীহ খুদে জানোয়ারটিকে আমার সঙ্গে নিয়ে নেব। নিউটনের একটা খেলার সাথী হবে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ওর নাম দিন টিমু।'

টিমু এখন আমারই পাশে চুপচাপ বসে আছে। একবার দুহাত দিয়ে প্লেনের দরজাটা ধরে অতি সন্তর্পণে মাথা উঁচিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করেছিল। তারপর ঠিক সেইরকমই ধীরে মাথাটাকে নামিয়ে নিয়ে আমার কোলের উপর রেখে চুপচাপ পড়ে আছে।

৫ই এপ্রিল, সকাল আটটা

Long 136 E—Lat 16 N। দেড়শো মাইল দূর এবং দুহাজার ফুট হাইট থেকে এইমাত্র যে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম সেটার কথা লিখে রাখি।

দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে একটা রামধনুর টুকরোর মতো দ্বীপ। অম্‌নিস্কোপ দিয়ে দেখে বুঝেছি এটাই আমার স্বপ্নে দেখা দ্বীপ। রংগুলো গাছপালার রং, তবে সেটা যে দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তা নয়। সামনের দিকে—অর্থাৎ আমাদের দিকে—রং কিছুটা কম, পিছন দিকটায় বেশি।

অম্‌নিস্কোপ এখন অবিনাশবাবুর হাতে। তাঁকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলিনি। তিনি দৃশ্য দেখে আহা উহু করছেন। বললেন, 'চলুন মশাই—ওইখানেই নামা যাক। ভারী মনোরম জায়গা বলে মনে হচ্ছে।'

আমার মন বিস্ময়ে ভরে উঠেছে। স্বপ্নও তা হলে সত্যি হয়। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই দ্বীপে পৌঁছে যাব। টিমু দিব্যি আছে।

www.BDeBooks.Com

৫ই এপ্রিল, সকাল সাড়ে নটা

আমরা দশ মিনিট হল ল্যান্ড করেছি। এমন একটা অদ্ভুত জায়গাও তা হলে পৃথিবীতে থাকতে পারে। গাছপালা যে অদ্ভুত হবে, সেটা তো আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এসে দেখছি এর মাটিও অন্যরকম। মাটি বলতে আমরা যা বুঝি, এটা তা নয়। এমনকী এটা

বালিও নয়। বালির চেয়ে অন্তত চারগুণ বড় লাল আর নীল রঙের দানার সমষ্টি এই মাটি। দূর থেকে লাল ও নীল একাকার হয়ে বেগুনিতে পরিণত হয় ; হাতে তুললে তবে বোঝা যায়, দানাগুলো আসলে দুরকম রঙের। দানার ওজন অসম্ভব রকম ভারী। একমুঠো হাতে নিয়ে মিনিটখানেকের বেশি রাখা যায় না—হাত টনটন করে।

আসল দেখবার জিনিস অবিশ্যি গাছপালা। দ্বীপের এদিকের গাছের রং দেখে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছি। স্বপ্নে দেখা রঙের জেল্লা এতে নেই। সব রঙের মধ্যেই যেন একটা কালোর ছোপ পড়েছে, ডালপালা কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে, গাছ নুইয়ে পড়েছে, ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এগুলো সব জীবন্ত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। তবে আমি জানি, দ্বীপের অন্য দিকটায় রঙের ছড়াছড়ি। এদিকে অবাক হতে হয় রং দেখে নয়, ফুল ফল পাতার সাইজ দেখে। একটু বিশ্রাম করে আমরা উলটোদিকটায় যাব।

শ্যাঙ্কোপ্লেনটা আমাদের হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চমৎকার কাজ দিয়েছে আমার নিজের হাতে তৈরি এই আকাশযানটি। টিমু চুপচাপ মাটিতে বসে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে নীল লাল দানাগুলো নাড়াচাড়া করছে। হাফপ্যান্ট পরা অবিনাশবাবু সমুদ্রের জলে হাত মুখ ধুয়ে কুলকুচি করে আমার কাছে এসে বনের দিকে দেখতে দেখতে বললেন, 'যাবার সময় সঙ্গে কিছু চারা নিয়ে যাবেন। আপনার বাগানে দু'একটা এরকম গাছ গজাতে পারলে বাহার হবে।'

ভদ্রলোক ফ্লোরোনার অনন্যসাধারণ বিশেষত্বটা বোধ হয় বুঝে উঠতে পারেননি, তাই ওঁর মনে বিস্ময়ের ভাব জাগছে না। টিমুর চালচলন লক্ষ করছি আগের চেয়ে যেন একটু বেশি দ্রুত। হয়তো তার মনেও একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তার গোল গোল চোখে সেটা নতুন করে প্রকাশ পাবার কোনও উপায় নেই।

এইমাত্র একটা ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ম আওয়াজ কানে এল। ঠিক যেন কেউ হাসছে। বোধ হয় কোনও পাখিটাখি হবে, যদিও এসে অবধি একটি প্রাণীও চোখে পড়েনি। মাটিতে কোনও পোকামাকড় পর্যন্ত আছে বলে মনে হয় না, জীবজন্তু তো দূরের কথা। এদিক দিয়ে জায়গাটাকে ভারী নিরাপদ বলে মনে হয়। তাই বোধ হয় মনটা কী রকম হালকা হয়ে গেছে। মাথাটাও হালকা লাগছে। আমার গিরিডির গবেষণাগারে, আমার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সমস্যা, অঙ্কের হিসাব আর ফরমুলা—সবই যেন অন্য জগতের অন্য আর এক যুগের জিনিস বলে মনে হচ্ছে।

এদিকটায় এসেছি। বড় অলস লাগছে। চারিদিকে রং। স্বপ্নের সব কিছুই এখানে। আরেক অদ্ভুত ঘটনা। সেই হারানো সাতজনই সবাই এখানে। কী হয়েছে তাঁদের জানি না। সবাই বসে আছেন হাত পা ছড়িয়ে। সবাই যেন খোকা। সবাই যেন বোকা। খালি হা হা করে হাসেন। আর কী লিখি। আর কিছুই নেই লেখার। আমায় ডাকছে বোধ হয়। হ্যাঁ, আমায় ডাকছে, যাই আমি।

অবিনাশবাবুর কথা

আমি শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছি। খাতা শঙ্কুমহাশয়ের। আজ তারিখ ৫ই এপ্রিল, সময় রাত আড়াইটা। লিখিবার অভ্যাস নাই। একমাত্র চিঠিপত্র ব্যতীত বহুকাল যাবৎ আর কিছু লিখি নাই। বাল্যকালে ইস্কুলে একবার প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষকের বাহবা পাইয়াছিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পরে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতেছি। আজিকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য। আমারও যদি কিছু হয়, এই খাতা যে ব্যক্তির হস্তে পড়িবে,

www.BDeBooks.Com

তিনি এক অবিস্মরণীয়, আতঙ্কজনক অলৌকিক ঘটনার বিষয় অবগত হইবেন। আমার পশ্চাতে বিশ হাত দূরে বন। বনের বৃক্ষাদি হইতে যে রঙিন আলোক নির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই আলোতেই লিখিতেছি। অন্য কোনও আলো নাই, কারণ আকাশ মেঘশূন্য হইলেও আজ অমাবস্যা।

এই দ্বীপে পঁহুছিয়া পূর্ব উপকূলে আধঘণ্টা কাল অবস্থানের পর শঙ্কু প্রস্তাব করিলেন যে, দ্বীপের অন্যত্র কী আছে বা না আছে তাহা একবার অনুসন্ধান করা উচিত। আকাশ হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে দ্বীপটি বৃত্তাকার, এবং এই বৃত্তের ডায়ামিটার দুই মাইলের অধিক নহে। আমরা স্থির করিলাম অনুসন্ধান পদব্রজে না করিয়া আকাশযানের সাহায্যেই করা হইবে। অতএব বৃথা কালক্ষয় না করিয়া টিমুবানরকে সঙ্গে লইয়া আমরা রওয়ানা হইলাম।

ভূমি হইতে পঞ্চাশ ফুট ঊর্ধ্বে থাকিয়া দশ মাইল বেগে আমরা পশ্চিম উপকূলের উদ্দেশে উড়িয়া চলিলাম।

এক মাইল পথ এইভাবে চলিবার পর আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে যতই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছি, নিম্নের বৃক্ষের বর্ণশোভা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সতেরো মিনিটকাল এইভাবে উড়িবার পর শঙ্কুমহাশয়ের আকাশযানটি পুনরায় ভূমি স্পর্শ করিল।

যান হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র একটা আশ্চর্য জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কাহার জানি একজোড়া সোনার চশমা মাটিতে পড়িয়া আছে, তাহার লেন্‌স্‌দ্বয় অপরাহ্ণের সূর্যালোকে ঝিক ঝিক করিতেছে। শঙ্কুমহাশয় একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া চশমাটি হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যামলিন।' অতঃপর আমরা হাঁটিয়া (টিমু আমার স্কন্ধে) আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে আরও কিছু আশ্চর্য জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথমে একটা ধূসরবর্ণ ফেল্ট টুপি, তারপর একটা ওয়াকিং স্টিক, তারপর একটা সবুজ রঙের রেশমের রুমাল, তারপর বাঁকানো পাইপ, এবং সর্বশেষে এইসমস্ত কিছুর পর একটা আস্ত মানুষ।

ইনি সম্ভবত জাপানি অথবা চিনদেশীয়। পরনে গাঢ় নীল রঙের সুট। দুইটি সু-জুতার একটি হাতে লইয়া হাসি হাসি মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লক্ষ করিলাম ভদ্রলোকের তিনটি দাঁত সোনা দিয়া বাঁধানো। শঙ্কুমহাশয় ভদ্রলোককে দেখিয়া 'হামাদা' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন। উক্ত শব্দের অর্থ আমার বোধগম্য হইল না। জাপানি (বা চিনা) ভদ্রলোকটি কোনও কথাই কহিলেন না। কেবল সেই একই ভাবে দন্ত বিকশিত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।

শঙ্কু মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, 'কী বুঝিতেছেন?' তিনি আমার প্রশ্নে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি যেন আনন্দে বিহ্বল। দুইবার লাফাইলেন। দুইবার হাততালি দিলেন। তৎপরে পুনরায় হাঁটিতে লাগিলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা আরও ছয়জন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম। ছয়জনই বিদেশীয়। অর্থাৎ ইউরোপবাসী। একজন তাঁহার মনিব্যাগ হইতে এক একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া ব্যাঙবাজি খেলার ভঙ্গিতে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেছেন, আর একজন অদম্য উৎসাহে ডিগবাজি খাইতেছেন, আর একজন জাঙিয়া পরিয়া দুই হাত নৃত্যের ভঙ্গিতে উত্তোলন করিয়া দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাহিতেছেন, আর একজন একটি ইংরাজি ছেলেভুলানো ছড়া—যাহার প্রথম পংক্তি 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ'—সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিটিকে শঙ্কুমহাশয় 'হ্যামলিন' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইবামাত্র ভদ্রলোক ব্ল্যাকশীপ ছাড়িয়া 'জ্যাকাঞ্জিল' ছড়াটি আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন।

অবশিষ্ট দুইজনকে দেখিতে পাইলাম বৃক্ষতলে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত অবস্থায়। ইহার পর

শঙ্কুমহাশয় তাঁহার কোটের পকেট হইতে তাঁহার লাল ডায়রি খাতাটি বাহির করিয়া সমুদ্রতটে বসিয়া কী যেন লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সবের অর্থ কী ? ইহারা কাহারা ? হ্যামলিন কে ? হামাদা কী ? ইহারা সকলেই ভদ্র এবং প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও নির্বোধ শিশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে কেন ? সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া আমি সবিশেষ চিন্তিত ও বিমূঢ়, কিন্তু আপনাকে এত নিশ্চিন্ত দেখিতেছি কেন ?' বলা বাহুল্য আমার কোনও প্রশ্নেরই কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। শঙ্কুমহাশয়ও দেখিলাম, অধিক লিখিতে পারিলেন না। খাতা ও ফাউন্টেন পেন তাঁহার পার্শ্বেই পড়িয়া রহিল, তিনি নির্বাক হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমার পকেট-ওয়াচে দেখি ছয়টা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এতক্ষণ সময় কাটিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিতেই পারি নাই। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই অস্তমিত হইবে। সমুদ্র প্রায় নিস্তরঙ্গ, সুতরাং জলের শব্দ নাই বলিলেই চলে। পক্ষীর কাকলিও নাই, কারণ পক্ষীই নাই। ঢিমু ব্যতীত অন্য কোনও পশুও নাই ; মশার শব্দ, তক্ষকের ডাক, শৃগালের চিৎকার, ভেকের কলরব, ঝিঁঝির ঐক্যতান— কিছুই নাই। চারিদিকে অপার্থিব আদিম নিস্তব্ধতা।

গাছপালার দিকে দৃষ্টি গেল। পত্র-পুষ্প-ফুলে প্রতিটি গাছ টইটম্বুর, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র স্পন্দনের আভাস নাই। সমস্ত প্রকৃতিই যেন রুদ্ধশ্বাসে কীসের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আরও একটি আশ্চর্য এই যে, ফুলফলের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও কোনও প্রকার গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিতেছে না, না দুর্গন্ধ, না সুগন্ধ।

আমি অবাক হইয়া চারিদিকের অপূর্ব বন্য শোভা লক্ষ করিতেছি, এমন সময় সহসা আলোক হ্রাস পাওয়াতে বুঝিলাম সূর্য অস্ত গেল। পরমুহূর্তেই অনুভব করিলাম সমুদ্রের দিক

www.BDeBooks.Com

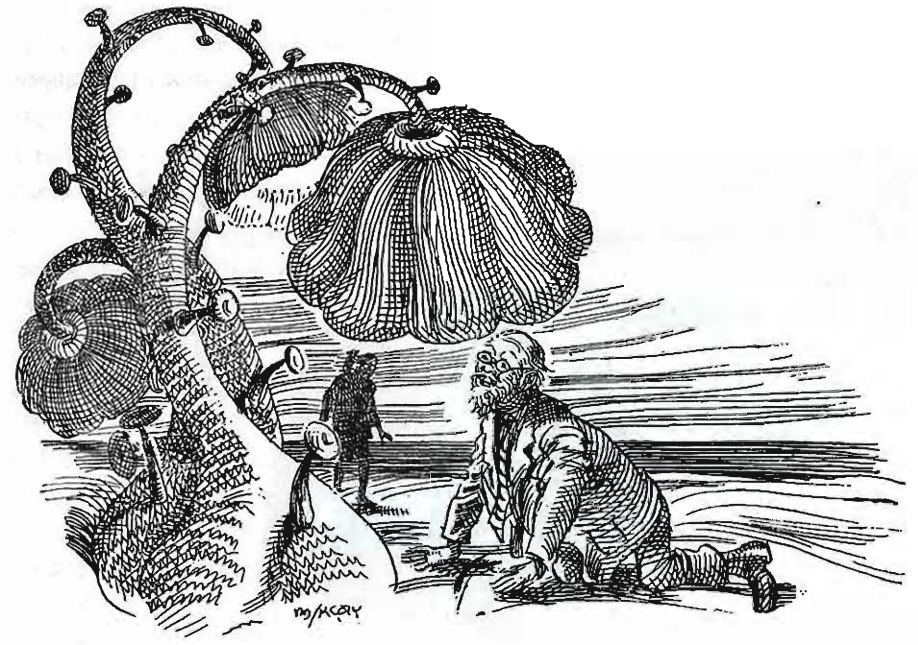

হইতে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া বনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিল। টিমুবানর আমা হইতে কিয়দ্দূরে বসিয়াছিল ; এক্ষণে সে ধীর পদক্ষেপে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া আমার স্কন্ধে স্থাপন করাতে সে তৎক্ষণাৎ আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। টিমু কি ভয় পাইয়াছে ? জানি না। ঈশ্বর করুন, নিরীহ বানরের যেন কোনওরূপ অনিষ্ট না হয়।

এ কীসের শব্দ ? সহসা চারিদিক হইতে সম্মিলিত সংগীতের মতো মিহি মোলায়েম স্বর উত্থিত হইতেছে।

হু হু হু হু রি রি রি রি করিয়া এই স্বর ক্রমে তীব্রতর হইয়া তারসপ্তকে উঠিল। আমি দুরু দুরু বক্ষে বনের দিকে চাহিতেই এক অদ্ভুত অভাবনীয় নূতন কাণ্ডের সূচনা লক্ষ করিলাম। বনের প্রতিটি বৃক্ষ যেন সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি পত্র, প্রতিটি ফুল ও ফল যেন সজীব ও অস্থির হইয়া বৃক্ষ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ছটফট করিতেছে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু বনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যেন আলোক বৃদ্ধি পাইতেছে।

শঙ্কুমহাশয় কি এ দৃশ্য দেখিতেছেন ?

অনুসন্ধানে বুঝিলাম তিনি স্থান পরিবর্তন করিয়াছেন অথবা করিতে চলিয়াছেন। শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া তিনি একটি বিশেষ বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই বৃক্ষটি অন্যগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, কারণ ইহার ফুলের রং বাদামি। এক একটি ফুল এক একটি বাঁধাকপির ন্যায় বৃহৎ। শঙ্কুমহাশয় বৃক্ষটির পাদদেশ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অবাক হইয়া দেখিলাম, বৃক্ষস্থিত বৃহদাকার ফলগুলি যেন তাঁহাকেই অভিবাদন করিবার জন্য তাঁহারই দিকে নত হইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি আমার মনে গভীর ত্রাসের সঞ্চার হইল। শঙ্কুমহাশয়

যখন বৃক্ষমূল হইতে সামান্য দূরে, তখন আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এক লম্ফে বৃক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ফুলটির নিম্নগতি রোধ করিবার জন্য আমার দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিলাম। পরমুহূর্তে ফুলটি এক আশ্চর্য কাণ্ড করিয়া বসিল, যাহার কথা ভাবিলে এখনও আমার সমস্ত দেহ হিম হইয়া আসে। ফুল যে সর্পের ন্যায় ছোবল মারিতে জানে, ইহা আমার ধারণাতীত ছিল। এক্ষণে বুঝিলাম, আমার জ্ঞান কত সীমিত। সেই প্রকাণ্ড ফুলের ছোবলে প্রথমত টিমু আমার স্কন্ধ হইতে ছিটকাইয়া দশ হাত দূরে পড়িল। তাহার পর আমিও ধরাশায়ী হইলাম। পতনের সময় ফুলটিকে জাপটাইয়া ধরার ফলে আমার হস্তে তাহার একটি স্তবকের একটি সামান্য ছিন্ন অংশ রহিয়া গেল।

আর শঙ্কুমহাশয়? তিনি নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হামাগুড়ি দিয়া বৃক্ষটির পাদদেশে পৌঁছিলেন, এবং ফুলটি নামিয়া আসিয়া তাঁহার মস্তক আচ্ছাদিত করিল। ইহার পর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখিলাম, ফুলের স্তবকগুলি শঙ্কুমহাশয়ের মস্তকের চতুর্দিকে বেষ্টন করিতেছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ফুলটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া গেল। এক্ষণে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম, ফুলের বাদামি রং মুহূর্ত মধ্যে হলুদে পরিণত হইল। এই হলুদে কমলার ছোপ। এই হলুদ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল, এবং সমগ্র বৃক্ষটিতে আন্দোলনের সঞ্চার হওয়ার ফলে এই হলুদকে লেলিহান অগ্নিশিখার মতোই প্রতীয়মান হইল।

শঙ্কুমহাশয়কে দেখিলাম, তিনি অন্য একটি বৃক্ষের দিকে হামাগুড়ি দিতেছেন।

আমি আর দেখিতে পারিলাম না। প্রায় দশ মিনিট কাল এইভাবে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া অবশেষে শঙ্কুমহাশয় পুনরায় আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, যদিও তিনি আমার নৈকট্য সম্পর্কে আদৌ সচেতন বলিয়া বোধ হইল না। অর্ধনিমিলিত নেত্রে দুই বাহু উত্তোলন করিয়া হাসি হাসি মুখে তিনি কেবল দুইটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—'টিডলি উইঙ্কস...টিডলি উইঙ্কস...টিডলি উইঙ্কস।'

প্রায় ত্রিশবার একইভাবে গদ্‌গদ কণ্ঠে উক্ত অর্থহীন শব্দটি উচ্চারণ করিয়া শঙ্কুমহাশয় ভূমিতে গাত্র এলাইয়া দিয়া হয় অচেতন না হয় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বনে এখন উন্মাদনা। ফল-ফুলের সূতীক্ষ্ণ বর্ণচ্ছটায় আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতেছে, তাহাদের সমবেত রি রি রি রি রি সংগীতে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম, তাহাদের তাণ্ডবলীলায় বক্ষে কণ্ঠরোধকারী ত্রাসের সঞ্চার। এ কি স্বপ্ন না সত্যি? আমার স্কন্ধে টিমুবানর এখনও সজাগ। তাহার আচরণে কোনওরূপ পরিবর্তন নাই। দুই হাতে এখনও সে আমার গলা বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয়ে পরিপার্শ্বের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইতেছে।

আমি বনের পার্শ্ব হইতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলাম। জাপানি ও বিদেশীয় যে সাতজনকে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের পুনরায় দেখিতে পাইলাম। তাহারা সকলেই এখন নিদ্রিত—হাত-পা ছড়াইয়া অসহায়ভাবে সমুদ্রতটে শায়িত। একমাত্র আমারই চক্ষু হইতে নিদ্রা বিতাড়িত। মনে মনে বলিলাম, শঙ্কুমহাশয়ের সহিত একত্রে দেশভ্রমণের বাসনা বোধ হয় চিরকালের জন্য মিটিল।

টিমুকে লইয়া একটি নির্জন স্থান দেখিয়া তথায় উপবেশন করিলাম। বিমানপোতটি যেমন রাখা ছিল তেমনই রহিয়াছে। সমুদ্রের জল তাহার দুই হাতের মধ্যে আসিয়া ছলাৎ ছলাৎ করিয়া পড়িতেছে। সামান্য তরঙ্গের আভাস দেখা যায় যেন জলের মধ্যে।

একমাত্র আমাদের দ্বীপ ব্যতীত আর সর্বত্রই প্রগাঢ় অন্ধকার। সমুদ্র কোথায় গিয়া আকাশের সঙ্গে মিলিয়াছে, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। মেঘমুক্ত আকাশে অগণিত নক্ষত্রের মধ্য দিয়া ছায়াপথ চলিয়া গিয়াছে। একটি উল্কাপাতও আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

www.BDeBooks.Com

মুহূর্তের জন্য মনে হইল আমি এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতেছি ; প্রকৃতপক্ষে আমি গিরিডিতেই আছি, নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিতে পাইব আমার পরিচিত অভ্যস্ত দৈনন্দিন জগতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সাময়িক ভ্রান্তি দূর হইল, এবং আমি পুনরায় বিষাদ ও আতঙ্কে নিমজ্জিত হইলাম। অতঃপর স্থির করিলাম, শঙ্কুমহাশয়ের খাতায় আজিকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। শঙ্কুমহাশয়কে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার আর কোনওদিন লেখনী ধারণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এ কী ? সহসা একটা আন্দোলন অনুভব করিতেছি কেন ? সমগ্র দ্বীপটাই যে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূমিকম্প নাকি ? জলরেখা আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন ? আমাদের আকাশযান ক্রমশ ভাসিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে কেন ? চারিপার্শ্ব হইতে হাহাকার উত্থিত হইতেছে কেন ?

এ কী—আমার হাফপ্যান্টের পশ্চাৎদেশে একটা আর্দ্র শীতলতা অনুভব করিতেছি কেন ? শেষ পর্যন্ত কি আমার অদৃষ্টে সলিলসমাধি রহিয়াছে ?

এখন আমার কোমর অবধি জল, আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় লিখিতেছি। টিমু আমার স্কন্ধে কম্পমান। দূরে সমুদ্রবক্ষে একটি আলোকবিন্দু দ্রুত অগ্রসর হইতেছে আমাদের দিকে। আর লেখা অসম্ভব। হে ইশ্বর—

প্রফেসর শঙ্কুর ডায়রি। গিরিডি, ৭ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা

আমি আজ আবার লিখতে পারছি। এই তিন মাসে আমার হারানো বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনেকটাই ফিরে পেয়েছি। আমি যে ঊনসত্তরটা ভাষা জানতাম, তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা এর মধ্যেই আবার বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। বাকি ক'টা নতুন করে শিখে নিতে আরও মাস দুয়েক লাগবে বলে মনে হয়।

কাল হ্যামলিনের একটা চিঠি পেয়েছি। নিজের ভাষাতেই লিখেছে, কিন্তু তার মধ্যে বানান ও ব্যাকরণ দুইয়েরই অনেক ভুল। ফলে মনে হয়, ওর প্রোগ্রেস আমার চেয়ে অনেক বেশি ঢিমে। বাকি কয়জনের খবর জানি না। অনুমান করা যায় তাঁরা সকলেই বেঁচে আছেন, কারণ জাহাজে সুস্থ অবস্থায় উঠেছিলাম সকলেই। এখনও ভাবতে ভয় হয় যে, আমি যদি একা গিয়ে ফ্লোরোনাতে উপস্থিত হতাম, তা হলে আমাকে উদ্ধার করার জন্য ম্যানিলা থেকে কোনও জাহাজ আসত না। ফ্লোরোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি ও অবিনাশবাবু দুজনেই সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতাম।

হ্যামলিনের চিঠিতে জানলাম যে আমি ক'দিন থেকে যেটা অনুমান করছি সেটা ঠিকই। আমরা সবাই একই স্বপ্ন দেখে একই আকর্ষণে ফ্লোরোনায় হাজির হয়েছিলাম। খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে আমরা আটজন ছাড়াও আরও বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ওই একই সময় একই স্বপ্ন দেখে ফ্লোরোনায় যাবার জন্য ছটফট করেছিলেন কিন্তু তাঁদের পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত ওই বেয়াড়া জায়গাটাতে গিয়ে পৌঁছানোর কোনও উপায় ছিল না।

ফ্লোরোনা-রহস্যের ষোলো আনা সমাধান কোনওদিনই হবে বলে মনে হয় না। তবে যেটুকু জানতে পেরেছি, তা থেকে বাকিটা অনুমান করে নেওয়া কঠিন না। ফ্লোরোনায় যে এক বিচিত্র প্রাণীর খপ্পরে পড়তে হয়েছিল সেটা তো বুঝতেই পেরেছি। এই বোঝার ব্যাপারে অবিনাশবাবুর অবদান কম নয়। গত বুধবার ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এসে আমায় একটা আশ্চর্য জিনিস উপহার দিলেন। হাতে নিয়ে রবারের টুকরো বলে মনে হল। ভদ্রলোকের দিকে চাইতেই তিনি হেসে বললেন, 'ফুলের ঘায়ে সত্যিই মূর্ছা গেসলুম মশাই। যে ফুল

আপনার মাথায় চেপেছিল—এ হল তারই পাপড়ির একটা টুকরো।'

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে জেনেছি, এই পাপড়ির সঙ্গে পৃথিবীর কোনও ফুলের কোনও পাপড়ির কোনও মিল নেই। এই পাপড়ির অ্যানাটমি অবিশ্বাস্য রকম জটিল ; প্রায় একজন মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে ধরনের জটিলতা থাকে, এতেও তাই।

ফ্লোরোনার পশ্চিম উপকূলে যাবার পর আমি কী করেছিলাম না-করেছিলাম, তা আমার মনে নেই, কিন্তু অবিনাশবাবুর বর্ণনা থেকে বুঝতে পারলাম এই ফুল কোনও আশ্চর্য উপায়ে আমার মস্তিষ্ক থেকে আমার বিদ্যাবুদ্ধির অনেকটা নিংড়ে বার করে নিয়েছিল। তারপর একের পর এক আরও অন্য ফুলও এই কাজটি করার ফলে শেষে আমি যে অবস্থায় পৌঁছেছিলাম, তার সঙ্গে একটা নির্বোধ শিশুর কোনও পার্থক্য নেই। হ্যামলিনদের সাতজনেরও এই একই ব্যাপার হয়েছিল।

অবিনাশবাবুর মতে আমাকে শোষণ করার পর গাছের রঙের জেল্লা নাকি আশ্চর্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এ থেকে একটা জিনিসই প্রমাণ হয়—এবং সেটা এতই অস্বাভাবিক যে লিখতেও সঙ্কোচ বোধ করছি—ফ্লোরোনা দ্বীপের গাছপালার খাদ্য হচ্ছে জ্ঞান, যে জ্ঞান তারা শুষে নেয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক থেকে। শুধু তাই নয়, তেমন ভাবে ক্ষুধার্ত হলে এরা উর্বরমস্তিষ্ক লোকদের স্বপ্ন দেখিয়ে আকর্ষণ করে নিজেদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। পৃথিবীর গাছপালা পুষ্টিকর খাদ্য আহরণ করে বাতাস, মাটি ও সূর্যের আলো থেকে। এই তিনটি জিনিসের একটিও যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না সেটা পূর্ব উপকূলের গাছগুলো দেখেই বুঝতে পারা গিয়েছিল।

সব শুনেটুনে অবিনাশবাবু বললেন, 'তা তো বুঝলাম—এরা না হয় জ্ঞান ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। কিন্তু তাই বলে দ্বীপটা শেষ পর্যন্ত জলের তলায় তলিয়ে গেল কেন বলুন তো ?'

আমি বললাম, 'ফ্লোরোনা আসলে একটা দ্বীপ কি না, সে-বিষয়েও আমার মনে খটকা রয়েছে। আমার তো মনে হয় দ্বীপ না হয়ে অন্য কোনও সৌরজগৎ থেকে ছিটকে আসা গ্রহ বা গ্রহের অংশও হতে পারে। এমনকী, অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা রকেট জাতীয়ও কিছু হতে পারে।'

আমার কথাটা শেষ হওয়ামাত্র কোত্থেকে জানি একটা ক্ষীণ, বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।

অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি, তিনিও আমারই মতো হতভম্ব। টিমু ও নিউটনও দেখি খেলা থামিয়ে মেঝের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কী হল ? কীসের শব্দ ? কে হাসল ?

এবার দৃষ্টি গেল আমার গবেষণার সাজসরঞ্জাম রাখা টেবিলের একটা কোণের দিকে। অবিনাশবাবুর দেওয়া পাপড়ির টুকরোটা সেখানে ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। নীচের দিকে চাইতে দেখলাম সেটা মাটিতে পড়ে আছে। অথচ আমি কিন্তু ফেলিনি।

পাপড়িটার রঙে কি সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে ?

ও সব আর ভেবে দরকার নেই। হাতের কাছেই দেরাজের মধ্যে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা ছিল ; পাপড়ির দিকে তাগ করে সেটার ঘোড়া টিপে দিলাম।

অন্তর্হিত পাপড়িটার জায়গায় কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবার থেকে দিনে দশ ঘণ্টা ঘুমোব।'

আমি বললাম, 'হঠাৎ এ কথা কেন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'রাত জেগে বই পড়ে মাথাটাকে জ্ঞানের ডিপো করে তো জীবনটাকে খোয়াতে বসেছিলেন। যা অবস্থা হয়েছিল আপনার, তাকে তো ছিবড়ে ছাড়া আর কিছুই বলা

www.BDeBooks.Com

যায় না—আবার জিজ্ঞেস করছেন, কেন ?'

ভদ্রলোককে দেবার মতো জুতসই কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না।

সন্দেশ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮

আশ্চর্য প্রাণী

১০ই মার্চ

গবেষণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমার জীবনে এর আগে এ রকম কখনও হয়নি। একমাত্র সান্ত্বনা যে এটা আমার একার গবেষণা নয়, এটার সঙ্গে আরও একজন জড়িত আছেন। হাম্‌বোল্টও বেশ মুষড়ে পড়েছে। তবে এত সহজে নিরুদ্যম হলে চলবে না। কাল আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে।

১১ই মার্চ

আজও কোনও ফল পাওয়া গেল না। যদি যেত, তা হলে অবিশ্যি সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যেত। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের হবে কি না সন্দেহ। আমি অবিশ্যি আমার হতাশা বাইরে প্রকাশ করি না, কিন্তু হাম্‌বোল্ট দেখলাম আমার মতো সংযমী নয়। আজ ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, ওর পোষা বিরাট গ্রেট ডেন কুকুরটার পাঁজরায় একটা লাথি মেরে বসল। হাম্‌বোল্টের চরিত্রের এ দিকটা আমার জানা ছিল না। তাই প্রথমটায় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবে রাগটা বেশিক্ষণ ছিল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই তুড়ি মেরে নেপোলিয়নকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নেপোলিয়নও দেখলাম দিব্যি লেজ নাড়ছে।

আজ প্রচণ্ড শীত। সকাল থেকে কনকনে হাওয়া বইছে। বাইরেটা বরফ পড়ে একেবারে সাদা হয়ে রয়েছে। বৈঠকখানার ফায়ারপ্লেসের সামনে বসেই আজ দিনটা কাটাতে হবে। আমি জানি হাম্‌বোল্ট আমাকে আবার সুপার-চেস খেলতে বাধ্য করবে। সুপার-চেস, অর্থাৎ দাবার বাবা। এটা হাম্‌বোল্টেরই আবিষ্কার। বোর্ডের সাইজ ডবল। ঘুঁটির সংখ্যা ষোলোর জায়গায় বত্রিশ, ঘুঁটির চালচলনও দাবার চেয়ে শতগুণে বেশি জটিল। আমার অবিশ্যি খেলাটা শিখে নিতে ঘণ্টা তিনেকের বেশি সময় লাগেনি। প্রথম দিন হাম্‌বোল্ট আমাকে হারালেও, কাল পর্যন্ত পর পর তিন দিন আমি ওকে কিস্তি মাৎ করে দিয়েছি। মনে মনে স্থির করেছি যে আজ যদি খেলতেই হয়, তা হলে ইচ্ছে করেই হারব। ওর মেজাজের যা নমুনা দেখলাম, ওকে একটু তোয়াজে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

১২ই মার্চ

আজ প্রথম একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। হয়তো বা শেষপর্যন্ত সত্যিই পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের হাতে প্রথম একটি প্রাণীর সৃষ্টি হবে। আজ মাইক্রোম্যাগনাস্কোপের সাহায্যে যে জিনিসটা ফ্লাস্কের মধ্যে দেখা গেল, সেরকম এর আগে কখনও দেখা যায়নি। একটা পরমাণুর আয়তনের cell জাতীয় জিনিস। হাম্‌বোল্ট দেখার পর আমি চোখ লাগানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবগতিক দেখে সেটাকে প্রাণী বলতে দ্বিধা হয় না, এবং এটার সৃষ্টি হয়েছিল যে আমাদের গবেষণার ফলেই, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। হাম্‌বোল্ট প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়েছিল বলাই বাহুল্য। সত্যি বলতে কী, যন্ত্রটা থেকে চোখ সরিয়ে নেবার পরমুহূর্তেই ও আমার কাঁধে এমন একটা চাপড় মারে যে, কাঁধটা এখনও টনটন করছে।

কিন্তু যেটা দুশ্চিন্তার কারণ সেটা হল এই যে, প্রাণী যদি সৃষ্টিও হয়, তার অস্তিত্ব কি হবে শুধুমাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য ? তা হলে লাভটা কী হবে ? লোককে ডেকে সে প্রাণী দেখাব কী করে ? ইউরোপের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা সে প্রাণীর কথা বিশ্বাস করবে কেন ?

যাকগে, এখন এসব কথা না ভাবাই ভাল। আমি নিজে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আজ যে ঘটনা আমাদের ল্যাবরেটরিতে ঘটেছে, তার তুলনীয় কোনও ঘটনা এর আগে পৃথিবীর কোথাও কোনও ল্যাবরেটরিতে কখনও ঘটেনি।

এই প্রাণী তৈরির ব্যাপারে আমরা যে-রাস্তাটা নিয়েছি, আমার মতে এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পারেন তখন পৃথিবীর অবস্থাটা কীরকম ছিল। সেই অবস্থাটা ভারী ভয়ংকর। সারা পৃথিবীতে ডাঙা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তার বদলে ছিল এক অগাধ সমুদ্র। পৃথিবীর উত্তাপ ছিল তখন প্রচণ্ড। এই সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটত। আজকাল বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে যেভাবে ঘিরে রয়েছে এবং তার আচ্ছাদনের মধ্যে মানুষকে অক্সিজেন, ওজোন ইত্যাদির সাহায্যে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে—তখন তা ছিল না। তার ফলে সূর্যের আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মি সোজা এসে পৃথিবীকে আঘাত করত। হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন সাল্‌ফার কার্বন ইত্যাদি গ্যাস অবশ্যই ছিল, আর এইসব গ্যাসের উপর চলত বৈদ্যুতিক প্রভাবের খেলা। প্রলয়ংকর বৈদ্যুতিক ঝড় ছিল তখন দৈনন্দিন ব্যাপার। এই অবস্থাতেই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়।

আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে যেটা করেছি সেটা আর কিছুই নয়—একটা ফ্লাস্কের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে এই আদিম আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছি। আমার বিশ্বাস এই অবস্থাটা বজায় রেখে কিছু দিন পরীক্ষা চালাতে পারলে আমাদের ফ্লাস্কের মধ্যে একটি প্রাণীর জন্ম হবে, যেটা হবে মানুষের তৈরি প্রথম প্রাণী। এই প্রাণী জীবাণুর আকারে হবে এটাও আমরা অনুমান করছি, এবং জীবাণুরই মতো হবে এর হাবভাব চালচলন।

প্রোফেসর হাম্‌বোল্টের সঙ্গে এ ব্যাপারে কীভাবে জড়িত হলাম, সেটা বলি। জার্মানির ব্রেমেন শহরে একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে আমি কৃত্রিম উপায়ে প্রাণসৃষ্টি সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ পড়ি। সভায় হাম্‌বোল্ট উপস্থিত ছিলেন। এই বিখ্যাত বায়োকেমিস্টের লেখা আমি আগে পড়েছি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল না। বক্তৃতার পর নিজে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমারই মতো বয়স, তবে লম্বায় আমার চেয়ে প্রায় এক হাত উঁচু। মাথায় চকচকে টাক, গোঁফ দাড়ির লেশ মাত্র নেই, এমনকী ভুরু বা চোখের পাতাও নেই। হঠাৎ দেখলে মাকুন্দ বলে মনে হয়। কিন্তু হ্যান্ডশেক করার সময় হাতে সোনালি লোম লক্ষ

www.BDeBooks.Com

করলাম।

সম্মেলনের অতিথিদের জন্য বক্তৃতার পর একটা বড় হলঘরে কফি ও কেক-বিস্কুটের ব্যবস্থা ছিল। ভিড় দেখে আমি একটা কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। মনটাও ভাল নেই, কারণ বক্তৃতার শেষে হাততালির বহর দেখে বুঝেছিলাম, আমার কথাগুলো শ্রোতাদের মনে ধরেনি। অর্থাৎ মানুষের হাতে প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিকেরা মানতে চায়নি। তাই বক্তৃতার শেষে দু' একজন ভদ্রতার খাতিরে প্রশংসা করলেও এগিয়ে এসে বিশেষ কেউই কথা বলছে না। এমন সময় প্রোফেসর হাম্‌বোল্ট হাসিমুখে এলেন আমার দিকে এগিয়ে। তাঁর হাতে দু' পেয়ালা কফি দেখে বুঝলাম তার একটা আমারই জন্যে। কফি পেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। জার্মান ভাষাতেই কথাবার্তা হল। হাম্‌বোল্ট তাঁর প্রথম কথাতেই আমাকে অবাক করে দিলেন—

'আমার পেপারটা আর পড়ার দরকার হল না।'

'তার মানে ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি যা বললে, আমারও সেই একই কথা।'

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, 'তাতে ক্ষতি কী ? এরা যখন আমার একার কথায় গা করছে না, সেখানে দুজনে বললে হয়তো কিছুটা কাজ হবে।'

হাম্‌বোল্ট মৃদু হেসে মৃদু স্বরে বললেন, 'এদের কিছু বলে বোঝাতে যাওয়াটা পণ্ডশ্রম। এসব ব্যাপারে কথায় কাজ হয় না, কাজ হয় একমাত্র কাজ দেখাতে পারলে। তুমি যা বললে, সেটা নিয়ে কিছু পরীক্ষা করেছ কি ?'

আমি বলতে বাধ্য হলাম যে আমার গিরিডির ল্যাবরেটরিতে যা সরঞ্জাম আছে তাই নিয়ে এই জটিল পরীক্ষায় নামা মুশকিল।

'কোনও চিন্তা নেই,' হাম্‌বোল্ট বললেন। 'তুমি চলে এসো আমার ওখানে।'

'কোথায় ?' হাম্‌বোল্ট কোথায় থাকতেন সেটা আমার জানা ছিল না।

'সুইটজারল্যান্ড। আমি থাকি সেন্ট গালেন শহরে। আমার মতো ল্যাবরেটরি ইউরোপে আর পাবে না।'

লোভ লাগল। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। ৫ই মার্চ অর্থাৎ ঠিক সাত দিন আগে সেন্ট গালেনে পৌঁছেছি। সুইটজারল্যান্ডের সব শহরের মতোই এটাও ছবির মতো সুন্দর। কন্‌স্ট্যান্স হ্রদের ধারে রোরশাক শহর থেকে ট্রেনে ন' মাইল। প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে। প্রথম দিন একটু ঘুরে দেখেছিলাম শহরটা, তারপর গবেষণার কাজ শুরু হয়ে যাওয়াতে আর বেরোতে পারিনি। হাম্‌বোল্টের ল্যাবরেটরি সত্যিই একটা আশ্চর্য জিনিস। এ ধরনের গবেষণা এখানে ছাড়া সম্ভব ছিল না। এখন এটা সফল হলেই হয়। আজ যে খানিকটা আশার আলো দেখা দিয়েছে, তার জন্য আমি অনেকটা দায়ী। প্রোটোভিট্রোমর্ফিজেনারাস সলিউশনে নিউট্র্যাল ইলেক্‌ট্রিক বম্‌বার্ডমেন্টের কথাটা আমিই বলেছিলাম। আমার বিশ্বাস তার ফলেই আজ কয়েক মুহূর্তের জন্য ওই পারমাণবিক প্রাণীটির আবির্ভাব হয়েছিল। কাল বম্‌বার্ডমেন্টের মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে দেব। দেখা যাক কী হয়।

নাঃ—আজ আর লেখা যাবে না। এইমাত্র হাম্‌বোল্টের চাকর ম্যাক্স বলে গেল, তার মনিব সুপার-চেসের ঘুঁটি সাজিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

১৪ই মার্চ

কাল ডায়েরি লিখতে পারিনি। লেখার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। তার মানে মনমরা অবস্থা নয়—একেবারে উল্লাসের চরম শিখর। এখনও ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। ঘড়িতে যদিও রাত আড়াইটা, চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। বার বার মন চলে যাচ্ছে হাম্‌বোল্টের ল্যাবরেটরির টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্কের ভিতরের আশ্চর্য প্রাণীটার দিকে। আমাদের যুগান্তকারী পরীক্ষার ফল এই প্রাণী।

কাল সন্ধ্যা ছ'টা বেজে তেত্রিশ মিনিটে এই প্রাণী জন্ম নেয়। আমার বিশ্বাস আমার অনুমান অনুযায়ী বম্‌বার্ডমেন্টের মাত্রাটা বাড়ানোর ফলেই এ প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে ; যদিও এ বিষয়ে আমি হাম্‌বোল্টের কাছে কোনও বড়াই করিনি। তাই বোধ হয় তার মনটাও খুশিতে ভরে আছে। সে হয়তো ভাবছে তার কৃতিত্ব আমারই সমান। ভাবুক গিয়ে। তাতে কোনও ক্ষতি নেই। আমাদের গবেষণা সফল হয়েছে এইটেই বড় কথা।

শুধু প্রাণীর জন্মটাই যে কালকের একমাত্র আশ্চর্য ঘটনা, তা নয়। জন্মের মুহূর্তে যে সব ব্যাপারগুলো ঘটল, তা এতই অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক যে, এখনও মনে পড়লে আমার শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ঘণ্টা একটানা দুজনে ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে বসে ছিলাম। বরফ পড়ছে, নেপোলিয়ন এসে ল্যাবরেটরির কার্পেটের উপর বসেছে, ম্যাক্স সবেমাত্র কফি দিয়ে গেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা বাজ পড়ার মতো প্রচণ্ড শব্দে আমাদের দুজনেরই প্রায় হার্টফেল হবার অবস্থা। অথচ আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই ; জানালা দিয়ে বাইরে ঝলমলে রোদ দেখা যাচ্ছে। এই বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার অনুভব করলাম একটা এক সেকেন্ডের ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি। তার তেজ এত বেশি যে, ঘরের জানালা আর টেবিলের কাচের জিনিসপত্রগুলো সব ঝনঝন করে উঠল, আর আমরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম টেবিলের উপর। তারপর কোনও রকমে টাল সামলে নিয়ে ফ্লাস্কের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটা আশ্চর্য জিনিস।

ফ্লাস্কের অর্ধেকটা ছিল জলে ভর্তি। প্রথমে লক্ষ করলাম যে, সেই জলের উপরের স্তরে একটা যেন ঢেউ খেলছে। অত্যন্ত ছোট ছোট তরঙ্গের ফলে জলের উপরটা যেন একটা সমুদ্রের খুদে সংস্করণ।

তারপর দেখলাম ইঞ্চিখানেক নীচের দিকে জলের মধ্যে কী যেন একটা চরে বেড়াচ্ছে। সেটাকে খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু সেটা পরমাণুর চেয়ে আয়তনে অনেকখানি বড়। আর তার চলার ফলে জলের ভিতরে যে একটা মৃদু আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

'বাতিটা নেবাও !'

হাম্‌বোল্টের হঠাৎ-চিৎকারে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার হাতের কাছেই লাইটের সুইচটা ছিল। সেটা নিবিয়ে দিতেই অন্ধকারে একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখলাম। প্রাণীটির একটা নিজস্ব নীল আলো আছে, সেই আলোটা জলের ভিতরে এঁকেবেঁকে চলে তার গতিপথ নির্দেশ করছে। আমরা দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ এইভাবে চেয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠতে বুঝলাম হাম্‌বোল্টের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটেছে। সে ঘরের এক পাশে সোফাটার উপর ধপ করে বসে পড়ল। তার ঘন ঘন হাত কচলানি থেকে বুঝলাম, সে এখনও উত্তেজনায় অস্থির।

আমি টেবিলের সামনেই কাঠের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললাম, 'এমন একটা ঘটনা বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচার করা উচিত নয় কি ?'

www.BDeBooks.Com

হাম্‌বোল্ট এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল হাত কচলাতে লাগল। বোধ হয় আমাদের আবিষ্কারের গুরুত্বটা সাময়িকভাবে তার মাথাটা একটু বিগড়ে দিয়েছে, সে পরিষ্কারভাবে কিছু ভাবতে পারছে না। তবু আমি একটা কথা না বলে পারলাম না—

'আমাদের এই প্রাণী যাতে কিছু দিন অন্তত বেঁচে থাকে, তার জন্য যা করা দরকার সেটা আমাদের করতেই হবে।'

হাম্‌বোল্ট বার দুয়েক মাথা নেড়ে অদ্ভুতভাবে চাপা ফিসফিসে গলায় প্রায় অন্যমনস্কভাবে ইংরিজিতে বলল, 'ইয়েস...ইয়েস...ইয়েস...'

এরপর থেকে হাম্‌বোল্ট আর দাবার উল্লেখ করেনি। কাল রাত্রে খাবার সময় সে একটি কথাও বলেনি। বেশ বুঝেছিলাম যে, তার অন্যমনস্কতা এখনও কাটেনি। কী ভাবছে সে, কে জানে!

আজ সারা দিন আমরা দুজন অনেকটা সময় কাটিয়েছি ল্যাবরেটরিতে। দিনের বেলায় ল্যাবরেটরির জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছি, যাতে ঘরটা অন্ধকার থাকে। অন্ধকারের মধ্যে যতবারই ঘরে ঢুকেছি, ততবারই প্রথমে চোখ চলে গেছে ফ্লাস্কের ওই নীল এঁকেবেঁকে-চলা আলোটার দিকে। কী নাম দেওয়া যায় এই জীবন্ত আলোকবিন্দুর? এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি।

১৫ই মার্চ

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে; নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলতে আর ইচ্ছে করছে না। হাম্‌বোল্টের ল্যাবরেটরিতে আজকে যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা আমাদের দুজনকেই একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের কোনও নিয়মই এখানে খাটে না। এটাকে অলৌকিক ভেলকি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

আমি কাল রাত্রে ঘুমিয়েছি প্রায় তিনটের সময় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও অভ্যাস মতো আমার ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাম্‌বোল্টও ভোরেই ওঠে, কিন্তু ছ'টার আগে নয়।

আমার মন পড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরির ফ্লাস্কের ভিতর, তাই বিছানা ছেড়ে উঠে প্রথমেই সটান চলে গেলাম ল্যাবরেটরিতে।

দরজা জানালা কাল বন্ধ ছিল। দরজার একটা ডুপ্‌লিকেট চাবি হাম্‌বোল্ট আমাকে দিয়ে রেখেছিল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে ফ্লাস্কের দিকে চাইতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

সেই নীল আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না।

আমি তৎক্ষণাৎ ধরেই নিলাম যে, প্রাণীটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাও ব্যাপারটা একবার ভাল করে দেখার জন্য টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আলো জ্বালতেই প্রথমেই দেখলাম যে, ফ্লাস্কে জল প্রায় নেই বললেই চলে। তার বদলে প্রায় অর্ধেকটা অংশ ভরে রয়েছে একটা খয়েরি রঙের পদার্থে। এই পদার্থের উপরটা প্রায় সমতল ; তারমধ্যে কয়েকটা ছোট ছোট জলে ভরা ডোবার মতো জায়গা, আর সেগুলোকে ঘিরে সবুজ রঙের ছোপ। অর্থাৎ যেটা ছিল সমুদ্র, সেটা এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে গেছে জলাভূমি।

কিন্তু আমাদের প্রাণী ?

এইবারে লক্ষ করলাম একটা ডোবার মধ্যে কিছুটা আলোড়ন। কী যেন একটা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সেখানে। আমি এগিয়ে গিয়ে একেবারে ফ্লাস্কের কাচের গায়ে চোখ লাগিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ নেই। একটা প্রাণী ডোবার জলের মধ্যে সাঁতার দিয়ে ডাঙায় এসে উঠল। প্রাণীটাকে খালি-চোখেই দেখা যাচ্ছে। সাইজে একটা সাধারণ পিঁপড়ের মতো বড়।

আমার মুখ থেকে একটা কথা আপনা থেকে বেরিয়ে পড়ল—'অ্যাম্‌ফিবিয়ান !'

অর্থাৎ আমাদের সৃষ্ট জলচর প্রাণী আজ আপনা থেকেই উভচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এ প্রাণী জলেও থাকতে পারে, ডাঙাতেও থাকতে পারে। পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হয়, অনুমান করা হয় সে প্রাণী জলচর ছিল। তারপর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনে পৃথিবী থেকে জল কমে যায় ; তার জায়গায় দেখা দেয় জলাভূমি। তার ফলে জলচর প্রাণীও ক্রমে নতুন পরিবেশে প্রাণধারণ করার উপযুক্ত একটা নতুন চেহারা নেয়। এই চেহারাটাই তার অ্যাম্‌ফিবিয়ান বা উভচর চেহারা। এ জিনিসটা অবশ্য রাতারাতি হয়নি। এটা ঘটতে লেগেছিল কোটি কোটি বছর। কিন্তু আমাদের ফ্লাস্কের মধ্যে ঠিক এই ঘটনাই ঘটে গেল দু' দিনের মধ্যে।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, প্রাণীটা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ মাইক্রোম্যাগ্‌নাস্কোপ দিয়ে সেটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলাম। কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক এই জাতীয় অ্যাম্‌ফিবিয়ানেরই ফসিল আমি দেখেছি বার্লিন মিউজিয়মে। ৬০০ কোটি বছর আগে এই

www.BDeBooks.Com

উভচর প্রাণী পৃথিবীতে বাস করত। মাছ আর সরীসৃপের মাঝামাঝি অবস্থা। রংটা লক্ষ করলাম সবুজ আর খয়েরি মেশানো। চেহারাটা যেন মাছ আর গিরগিটির মাঝামাঝি।

আরও একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম। ডোবার ধারে ধারে যেটাকে সবুজ রং বলে মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে অতি সূক্ষ্ম আকারের সব গাছপালা।

হাম্‌বোল্ট বোধ হয় অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখির কাজ করেছে, তাই তার ঘুম ভাঙতে হয়ে গেল সাড়ে সাতটা। বলা বাহুল্য, ফ্লাস্কের ভিতরে ভেলকি দেখে আমারই মতো হতবাক অবস্থা তারও।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে হাম্‌বোল্ট প্রথম মুখ খুলল—'আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরে কি পৃথিবীর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের একটা মিনিয়েচার সংস্করণ ঘটতে চলেছে।'

আমিও মনে মনে এটাই সন্দেহ করেছিলাম। বললাম, 'সেটা শুধু আজকের এই একটা ঘটনাতে প্রমাণ হবে না। এখন থেকে শুরু করে পর পর কী ঘটে, তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে।'

'হুঁ।'

হাম্‌বোল্ট কিছুক্ষণ চুপ। তার ঠোঁটের কোণে সেই অদ্ভুত হাসি, যেটা প্রথম প্রাণীর উদ্ভবের সময় থেকেই মাঝে মাঝে লক্ষ করছি। অবশেষে একটা সসেজের টুক্‌রো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, 'তার মানে এর পরে উদ্ভিদজীবী সরীসৃপ। তারপর স্তন্যপায়ী মাংসাশী জানোয়ার, তারপর...তারপর...'

হাম্‌বোল্ট থামল। তারপর কাঁটাচামচ নামিয়ে রেখে হাত দুটো কচলাতে কচলাতে বলল, 'আজ থেকে সতেরো বছর আগে, ওসাকায় একটা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীবৈঠকে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পড়ে ছিলাম। সে প্রবন্ধ শুনে সভার লোক আমায় ঠাট্টা করেছিল, পাগল বলে গালমন্দ করেছিল। আজ ইচ্ছে করছে, তারা এসে দেখুক আমি কী করেছি...'

আমি চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, হাম্‌বোল্ট প্রাণসৃষ্টির কৃতিত্বটা অম্লানবদনে নিজে একাই নিয়ে নিচ্ছে। অথচ আমি জানি যে, যদি শেষ মুহূর্তে আমার মাথা না খেলত—বম্‌বার্ডমেন্টের মাত্রা যদি না বাড়ানো হত—তা হলে পরীক্ষা সফল হত না। গবেষণার গোড়াতে হাম্‌বোল্টের কথাতেই কাজ চলছিল, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। সেটা হাম্‌বোল্টও জানে, কিন্তু তাও...

যাকগে। এ সবে কিছু এসে যায় না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছোট মনের পরিচয় আমি আগেও পেয়েছি। তারাও তো মানুষ, কাজেই তাদের অনেকের মধ্যেই ঈর্ষাও আছে, লোভও আছে। এ নিয়ে আর কোনও মন্তব্য বা চিন্তা না করাই ভাল।

ক'দিন একটানা বাড়ির ভেতর থাকতে হয়েছে, তাই আজ দিনটা ভাল দেখে ভাবলাম, একটু বেড়িয়ে আসি। দু-একটা চিঠি লেখা দরকার, অথচ ডাকটিকিট নেই, তাই সোজা পোস্টাপিসের দিকে রওনা দিলাম।

রাস্তায় বরফ পড়ে আছে, শীতটাও চনমনে, কিন্তু আমার কোটের পকেটে একটা এয়ার কন্ডিশনিং পিল থাকার জন্য অতিরিক্ত গরমজামার কোনও প্রয়োজন হয়নি। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, ওভারকোট পরা রাস্তার লোকেরা আমার দিকে উদ্বিগ্নভাবে বার বার ফিরে ফিরে দেখছে।

পোস্টাপিসে টিকিট কেনার সময় মনে হল যে, এইখান থেকে ইচ্ছে করলে লন্ডনে টেলিফোন করা যায়। সোজা ডায়াল করলেই যখন নম্বর পাওয়া যায়, তখন আমার বন্ধু প্রফেসর সামারভিলকে একটা খবর দিলে কেমন হয়? সামারভিল বায়োকেমিস্ট; কৃত্রিম

উপায়ে প্রাণী তৈরির ব্যাপারে এককালে তার সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি হয়েছিল।

সামারভিলকে টেলিফোনে পেতে লাগল ঠিক এক মিনিট।

কোনওরকমে সংক্ষেপে তাকে ব্যাপারটা বললাম। সামারভিল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একে কৃত্রিম প্রাণী, তার উপরে দু' দিনের মধ্যে জলচর থেকে উভচর। শেষটায় সামারভিল বলল, 'তুমি কোত্থেকে ফোন করছ ? ইন্ডিয়া নয় নিশ্চয়ই ?'

বললাম, 'না না, তার চেয়ে অনেক কাছে। আমি আছি সেন্ট গালেনে।'

'কেন ? সেন্ট গালেনে কেন ?' সামারভিল অবাক।

বললাম, 'প্রোফেসর হাম্‌বোল্টের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি আমি।'

তিন সেকেন্ড কোনও কথা নেই। তার পর শোনা গেল—

'হাম্‌বোল্ট ? কর্নেলিয়াস হাম্‌বোল্ট ? কিন্তু সে যে—' লাইন কেটে গেল।

মিনিটখানেক চেষ্টা করেও কোনও ফল হল না। সামারভিলের বাকি কথাটা আর শোনা হল না। তবে এটা বুঝেছিলাম যে আমার সহকর্মীর নাম শুনে সে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে !

কী আর করি ? বাড়ি ফিরে এলাম। হাম্‌বোল্ট যে একটু গোলমেলে লোক, সে তো আমি নিজেও বুঝেছি। কিন্তু এটাও তো মনে রাখতে হবে যে তার মতো এমন ল্যাবরেটরিতে এমন একটা এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ হাম্‌বোল্টই আমাকে দিয়েছে।

আজ সারাদিন ল্যাবরেটরিতে অনেকটা সময় কাটিয়েছি আমি আর হাম্‌বোল্ট। মাইক্রোফোটোগ্রাফিক ক্যামেরা দিয়ে প্রাণীটার কয়েকটা ছবিও তুলেছি। এটা বেশ বুঝেছি যে, প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের কিছুই করতে হবে না। তার জন্য অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনা থেকেই ফ্লাস্কের ভিতর তৈরি হয়ে রয়েছে। সেই পরিবেশ বদল না হওয়া পর্যন্ত এ প্রাণী ঠিকই থাকবে।

১৬ই মার্চ

যা ভেবেছিলাম তাই। আজ সরীসৃপ। আমার প্রাণীর তৃতীয় অবস্থা। আয়তনে আগের প্রাণীর চেয়ে প্রায় দশগুণ বড়। মাইক্রোম্যাগ্‌নাস্কোপের প্রয়োজন হবে না। এমনি চোখে দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে এর আকৃতি ও প্রকৃতি। এর চেহারা আমাদের কাছে অতি পরিচিত। পৃথিবীর অনেক জাদুঘরেই এই কঙ্কাল রয়েছে। সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে আয়তনে যেটি সবচেয়ে বড় ছিল—এ হল সেই ব্রন্টোসরাস। সেই ষাট ফুট লম্বা দানবসদৃশ প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের একটি দু' ইঞ্চি সংস্করণ দিব্যি আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরের জমিতে হাঁটছে, শুচ্ছে, বসছে, আর দরকার হলে খুদে খুদে গাছের খুদে খুদে ডাল পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

খুব আপশোস হল একটা কথা ভেবে—কাল রাতটা কেন ফ্লাস্কের সামনে বসে রইলাম না ? থাকলে নিশ্চয়ই পরিবর্তনটা চোখের সামনে দেখতে পেতাম। আজ স্থির করলাম যে যতক্ষণ না ফ্লাস্কের ভিতরে একটা কিছু ঘটে ততক্ষণ ল্যাবরেটরি ছেড়ে কোথাও যাব না। এখন রাত সোয়া বারোটা। আমি ল্যাবরেটরিতে বসেই আমার ডায়রি লিখছি। হাম্‌বোল্টও সামনে বসে আছে। কেবল মাঝে একবার টেলিফোন আসাতে উঠে চলে গিয়েছিল। কে ফোন করেছিল জানি না। যেই করুক, হাম্‌বোল্ট তার সঙ্গে বেশ উত্তেজিত ও উৎফুল্লভাবে কথা বলছিল। এটা মাঝে মাঝে তার উদাত্ত গলার স্বর থেকেই বুঝতে পারছিলাম, যদিও দুটো ঘরের মধ্যে ব্যবধানের ফলে কথা বুঝতে পারছিলাম না।

www.BDeBooks.Com

ব্রন্টোসরাসটা এখন বিশ্রাম করছে। ফ্লাস্কের ভিতরটা কেমন জানি ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। হয়তো কিছু একটা ঘটবে। লেখা বন্ধ করি।

১৬ই মার্চ, রাত একটা বেজে ছত্রিশ মিনিট

দু' মিনিট আগে সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেল। যে ধোঁয়াটে ভাবটার কথা লিখেছিলাম সেটা আর কিছুই না—ফ্লাস্কের ভিতরে উপর দিকটায় মেঘ জমছিল। মিনিট পাঁচেক এইভাবে মেঘ জমার পর অবাক হয়ে দেখলাম একটা মিহি বাষ্পের মতো জিনিস মেঘ থেকে নীচে জমির দিকে নামছে। বুঝলাম সেটা বৃষ্টি। আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরের ভূখণ্ডটির উপর বৃষ্টি হচ্ছে।

শুধু বৃষ্টি নয়। পর পর কয়েকটা বিদ্যুতের চমকও লক্ষ করলাম—আর সেই সঙ্গে মৃদু মেঘের গর্জন। যদিও সে গর্জন কান ফাটা কোনও শব্দ নয়, কিন্তু ফ্লাস্কটা ও টেবিলের অন্যান্য কাচের যন্ত্রপাতি সেই গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে উঠছিল।

বৃষ্টির মধ্যে আমাদের প্রাণীর কী অবস্থা হচ্ছে, সেটা দেখার কোনও উপায় ছিল না, কারণ বাষ্পের জন্য ফ্লাস্কের ভিতরের সূক্ষ্ম ডিটেল সব ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

আমরা দুজনেই তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে একটা সময় এল যখন বুঝতে পারলাম বৃষ্টিটা থেমে গেছে। মেঘ কেটে গেল, বাষ্প সরে গিয়ে ফ্লাস্কের ভিতরটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলাম জমির রং একেবারে বদলে গেছে। আগের অবস্থায় যা ছিল তামাটে, এখন সেটা হয়েছে ধবধবে সাদা।

আমরা দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—'বরফ!'

বরফটা সমতল নয়। তার মধ্যে উঁচু নিচু আছে, এবড়োখেবড়ো আছে, এক এক জায়গায় বরফের চাঁই মাটি থেকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে পাহাড়ের মতো।

আমি বললাম, 'আমরা কি ফ্লাস্কের মধ্যে আইস-এজের একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি!'

হাম্‌বোল্ট বলল, 'তা হবেও বা। কিংবা যে কোনও সময়ের মেরুদেশের দৃশ্যও হতে পারে।'

আইস-এজ বা তুষারপর্বের সময় হচ্ছে আজ থেকে সাত-আট লক্ষ বছর আগে। বরফ তখন মেরুদেশ থেকে নীচের দিকে সরতে সরতে প্রায় সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছিল।

হাম্‌বোল্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'ওই যে! ওই যে আমাদের প্রাণী!'

একটা বরফের গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা লোমশ জানোয়ার। এক ইঞ্চির বেশি লম্বা নয় সেটা। জানোয়ারটা চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হাম্‌বোল্ট মাইক্রোম্যাগ্‌নাস্কোপটা চোখে লাগাল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—

'বুঝেছি! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! পাগুলো বেঁটে বেঁটে, মাথার সামনের দিকে দুটো শিং, ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। এ হল লোমশ গণ্ডার! আমাদের স্তন্যপায়ী জানোয়ার!'

এবার আমি চোখে লাগালাম যন্ত্রটা। হাম্‌বোল্ট ঠিকই বলেছে। গণ্ডারের আদিম সংস্করণ—যাকে বলে Woolly Rhinoceros। বরফের দেশেই বাস করত এ জানোয়ার।

বুঝতে পারলাম, আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরে এভোলিউশন বা ক্রমবিবর্তনের ধারা ঠিকই বজায় আছে। আজকের বিবর্তনের ঘটনাটা যে আমরা চোখের সামনে ঘটতে দেখছি, এটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা। আমাদের ষোলো ঘণ্টা এক নাগাড়ে ল্যাবরেটরিতে বসে থাকা সার্থক হয়েছে।

কাল সকালে সামারভিলকে আরেকটা ফোন করে তাকে একবার আসতে বলব। এমন

একটা অলৌকিক ঘটনা কেবলমাত্র দুটি বৈজ্ঞানিকের সামনে ঘটে চলবে, এটা অন্যায়, এটা হতে দেওয়া চলে না।

১৭ই মার্চ

আজ সাংঘাতিক গণ্ডগোল। আজ আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে এ যাত্রা বেঁচে গেছি, কিন্তু কী ধরনের বিপদসংকুল পরিবেশে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কী হল সেটা গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি।

সামারভিলকে আর একবার টেলিফোন করার কথা কালকেই মনে হয়েছিল। হাম্‌বোল্ট সম্পর্কে ও কী বলতে চেয়েছিল সেটা জানার জন্যও একটা কৌতূহল হচ্ছিল। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোতে যাব, এমন সময় হাম্‌বোল্ট জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

বললাম, 'গিরিডিতে আমি রোজ সকালে হাঁটতে বেরোই, তাই এখানে এসেও মাঝে মাঝে সেটার প্রয়োজন বোধ করি।'

হাম্‌বোল্ট শুকনো গলায় বলল, 'সেদিন পোস্টাপিস থেকে কাকে টেলিফোন করেছিলে ?'

আমি তো অবাক। লোকটা জানল কী করে ? সারা শহরে কি গুপ্তচর বসিয়ে রেখেছে নাকি হাম্‌বোল্ট ?

আমার প্রশ্নটা বোধ হয় আঁচ করেই হাম্‌বোল্ট বলল, 'এ শহরের প্রত্যেকটি লোককে আমি চিনি, প্রত্যেকেই আমাকে সমীহ করে। আমার বাড়িতে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অতিথি এসে রয়েছে, সে খবরও সকলে জানে। তাদের যে কোনও একজনের কাছ থেকে খবরটা আমার কানে আসাটা কি খুব অস্বাভাবিক ?'

আমি বললাম, 'অস্বাভাবিক নয় মোটেই। কিন্তু তোমার এভাবে আমাকে জেরা করাটা আমার অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তবু—যখন জিজ্ঞেস করছ, তখন বলছি—আমার এক বন্ধুকে ফোন করেছিলাম।'

'কোথায় ?'

'লন্ডনে।'

'সে কি বৈজ্ঞানিক ?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলেছিলে তাকে ?'

আমার ভারী বিরক্ত লাগল। লোকটা ভেবেছে কী ? হতে পারে আমি তার অতিথি ; হতে পারে সে আমাকে তার ল্যাবরেটরিতে তার সঙ্গে একজোটে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে ; কিন্তু তাই বলে কি সে আমায় কিনে রেখেছে ? আমার নিজের কোনওই স্বাধীনতা নেই ? বললাম, 'দুজন বন্ধুর মধ্যে কী কথা হচ্ছিল, সেটা জানার জন্য তোমার এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না।'

হাম্‌বোল্ট চাপা অথচ কর্কশ গলায় বলল, 'কৌতূহল হচ্ছে এই কারণেই যে আমার ল্যাবরেটরিতে যেটা ঘটছে, সেটা সম্বন্ধে কোনও মিথ্যে খবর বাইরে প্রচার হয় সেটা আমি চাই না।'

'মিথ্যে খবর বলতে তুমি কী বোঝ ?'

হাম্‌বোল্ট এতক্ষণ চেয়ারে বসেছিল। এবার সে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এসে, আমার মুখের সামনে মুখ এনে সাপের মতো ফিসফিসে গলায় বলল, 'পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের হাতে প্রথম প্রাণ সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্ব হল কর্নেলিয়াস হাম্‌বোল্টের। এ

www.BDeBooks.Com

কথাটা যেন মনে থাকে।'

বুঝতে পারলাম, সামারভিলকে ফোনটা আর করা হবে না। মুখে কিছু বললাম না, যদিও লোকটাকে চিনতে আর বাকি ছিল না। কিন্তু একবার যখন বেরোব বলেছি, তখন বেরোলাম। গেট থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ দিকের রাস্তায় শহরের দিকে না গিয়ে ডান দিকের রাস্তাটা ধরে পাহাড়ের উপর দিকটায় চললাম। এ রাস্তাটা দিয়ে প্রথম দিনই বেড়িয়ে এসেছিলাম। কিছু দূর গেলেই একটা সুন্দর নিরিবিলি বার্চের বন পড়ে। সেখানে একটা বেঞ্চিতে বসলে দু'হাজার ফুট নীচে কন্‌স্ট্যান্‌স লেক দেখা যায়।

বার্চ বনে পৌঁছে বেঞ্চিটা খুঁজে বার করে বসতে যাব, এমন সময় কানের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে কী যেন একটা জিনিস তিরবেগে বেরিয়ে গিয়ে আমার তিন হাত দূরে একটা বার্চ গাছের গুঁড়িতে গিয়ে বিঁধে গেল।

সেই মুহূর্তেই পিছন ফিরে দেখতে পেলাম একটা ব্রাউন কোট পরা লোক প্রায় একশো গজ দূরে এক দৌড়ে একটা ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি প্রায় কোনও অবস্থাতেই নার্ভাস হই না। এখনও হলাম না। বেঞ্চি ছেড়ে গাছটার দিকে গিয়ে তার গায়ে টাটকা নিখুঁত গর্তটা পরীক্ষা করে দেখলাম। যদিও কোনও বন্দুকের আওয়াজ আমি পাইনি, এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে, গর্তটা হয়েছে গুলি লাগার ফলেই। অস্ত্রটিও যে মোক্ষম—সেটা বুঝতে বাকি রইল না, কারণ গুলি গুঁড়ির একদিক দিয়ে ঢুকে বেমালুম অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে।

আমি আর অপেক্ষা না করে ধীর পদক্ষেপে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

হাম্‌বোল্টের বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকেই দেখতে পেলাম চাকর ম্যাক্সকে। তার গায়ে একটা ব্রাউন চামড়ার জ্যাকেট। ম্যাক্স আমাকে দেখে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে গেট দিয়ে বেরিয়ে শহরের দিকে চলে গেল।

বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানার দিকে যেতেই দেখলাম হাম্‌বোল্ট দুজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। আমাকে দেখে নির্বিকারভাবে তিনি ডাক দিলেন—'কাম ইন, প্রোফেসর শঙ্কু।'

আমি নির্বিকারভাবেই বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম। আগন্তুক দুটি উঠে দাঁড়ালেন। একজন ছোকরা, অন্যটি মাঝবয়সি। তাদের হাতে খাতা-পেনসিল দেখে আন্দাজ করলাম তারা খবরের কাগজের রিপোর্টার। হাম্‌বোল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাঝখানে আমি এসে পড়েছি। হাম্‌বোল্ট আমার পরিচয় দিলেন, এবং যেভাবে দিলেন, তাতে বুঝলাম যে লোকটার ধৃষ্টতা একেবারে চরমে পৌঁছে গেছে।

'ইনিই হচ্ছেন আমার ভারতীয় অ্যাসিস্‌ট্যান্ট, যার কথা আপনাদের বলছিলাম।'

আমি করমর্দন করে একটা ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসি হেসে 'এক্‌সকিউজ মি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা ল্যাবরেটরিতে চলে গেলাম।

টেবিলের কাছে পৌঁছে ফ্লাস্কের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

বরফ আর নেই। তার জায়গায় এখন রয়েছে একটা সবুজ বন, আর সেই বনে ঘোরাফেরা করছে আর একটি নতুন প্রাণী, যার নাম বানর। যাকে বলা হয় প্রাইমেট। যিনি হলেন মানুষের পূর্বপুরুষ।

কথাটা মনে হতেই বুকের ভিতরটা কী রকম যেন করে উঠল।

এর পরেই কি তা হলে মানুষের দেখা পাব ফ্লাস্কের মধ্যে? ক্রমবিবর্তনের নিয়ম যেভাবে মেনে চলেছে আমাদের প্রাণী, তাতে তো মনে হয় বানরের পরে মানুষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। হাম্‌বোল্ট কি দেখেছে ফ্লাস্কের এই বানরকে?

তারপরেই মনে হল, আজকে বার্চ বনে আমাকে লক্ষ্য করে মারা নিঃশব্দ বন্দুকের কথা। হাম্‌বোল্ট চাইছে না আমি বেঁচে থাকি। ম্যাক্সের কাছে অস্ত্র আছে। প্রভুভক্ত ম্যাক্স একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে দ্বিতীয়বারও হবে এমন কোনও কথা নেই।

শয়তানির বিরুদ্ধে শয়তানি প্রয়োগ করা ছাড়া হাম্‌বোল্ট আমার জন্য আর কোনও রাস্তা রাখছে না।

আমি দোতলায় আমার ঘরে চলে গেলাম। আমার অম্‌নিস্কোপটা বার করে চোখে লাগিয়ে জানালার ধারে চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। আমার এই চশমাটাকে ইচ্ছামতো মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ অথবা এক্সরেস্কোপ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আমার জানালা থেকে বাড়ির সামনের গেটটা দেখা যায়।

পৌনে দশটার সময় ম্যাক্স বাড়ি ফিরল। তার হাতে বাজার থেকে কিনে আনা জিনিসপত্র।

পাঁচ মিনিট পরে আমি কলিং বেল টিপলাম। এক মিনিটের মধ্যে ম্যাক্স ঘরে এসে হাজির।

'আমাকে এক কাপ কফি এনে দিতে পারবে ?' বললাম ম্যাক্সকে।

'যে আজ্ঞে' বলে ম্যাক্স ঘাড়টাকে সামান্য নুইয়ে কফি আনতে চলে গেল। আমার চোখে এক্স-রে চশমা। সে চশমা ম্যাক্সের চামড়ার কোট ভেদ করে আমাকে দেখিয়ে দিল তার ভেস্ট পকেটে রাখা লোহার পিস্তলটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাক্স কফি সমেত হাজির। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রাখার পর আমি তাকে বললাম, 'ম্যাক্স, আলমারির চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না ; তোমার কোর্টের বাঁ পকেটে যে চাবির গোছাটা আছে, তার মধ্যে কোনওটা ওতে লাগবে কি ?'

ম্যাক্সের মুখ হাঁ হয়ে গেল, এবং সেই হাঁ অবস্থাতেই সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। হেসে বললাম, 'আমি ইন্ডিয়ার লোক, জান তো ? আমাদের অনেকের মধ্যেই নানারকম অস্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। তুমি অবাক হচ্ছ কেন ?'

ম্যাক্স তোতলাতে শুরু করল। 'আপনি আ-মার প-পকেটে কী আছে...'

'আরও জানি। শুধু তোমার বাঁ পকেটে কেন—ডান পকেটে খুচরো পয়সাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, আর ভেতরের ভেস্ট পকেটে পিস্তলটা—যেটা দিয়ে তুমি আমায় খুন করতে গিয়েছিলে। ভারী অন্যায় করেছিলে তুমি। দেখলে তো আমাকে মারা অত সহজ নয়। এখন কত দেবতার কত অভিশাপ পড়বে তোমার উপর, সেটা ভেবে দেখেছ ?'

ম্যাক্স দেখি ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। এই শীতের মধ্যেও তার কপালে ঘাম ছুটছে। মনে মনে আমার হাসি পেলেও বাইরে একটা কঠোর গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বসে রইলাম।

ম্যাক্স হঠাৎ ধপ করে হাঁটু গেড়ে কাঠের মেঝের উপর বসে পড়ল। তারপর তার কম্পমান ডান হাত জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তলটা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, 'দোহাই আপনার—এর জন্যে আমাকে দায়ী করবেন না। আমি শুধু মনিবের হুকুম পালন করেছি। না করলে নিস্তার পাব না, তাই করেছি। আমার অপরাধ নেবেন না—দোহাই আপনার ! আমার মনিবকে আপনি চেনেন না। উনি বড় সাংঘাতিক লোক। আমি এ চাকরি থেকে রেহাই পেলে বাঁচি...'

আমি পিস্তলটা ম্যাক্সের হাত থেকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম। সেটা যে হাম্‌বোল্টেরই তৈরি, সেটা বুঝতে পারলাম। বললাম, 'এর গুলি নেই তোমার কাছে ?'

'আজ্ঞে না। একটি মাত্র ছিল, সেটা আজ সকালে খরচ করে ফেলেছি। গুলি তো

www.BDeBooks.Com

আমার মনিব নিজেই তৈরি করেন।'

বললাম, 'তোমার মনিব আবার তোমার কাছে পিস্তল ফেরত চাইবেন না তো ?'

'মনে হয় না। ওটা আমার কাছেই থাকে। আমি শুধু ওঁর চাকর নই। ওঁর দেহরক্ষীর কাজও আমাকে করতে হয়।'

ম্যাক্স চলে গেল। আমিও হাঁপ ছেড়ে চোখ থেকে অম্‌নিস্কোপটা খুলে পকেটে রেখে কফিতে চুমুক দিলাম। মনে মনে স্থির করলাম, এখন আর ঘর থেকে বেরোব না। হাম্‌বোল্টের মুখ দেখতেও ইচ্ছে করছিল না। সেও এখন আর আমার ঘরে আসবে না বলেই আমার বিশ্বাস। দেখা হবে সেই একেবারে লাঞ্চের সময়।

১৯শে মার্চ

গত দুদিনের ঘটনা এত বিচিত্র, এত বিস্ময়কর ও এত আতঙ্কজনক যে সবটুকু গুছিয়ে লেখা আমার মতো অ-সাহিত্যিকের পক্ষে একটা দুরূহ কাজ। ভাগ্যে সামারভিল এসে পড়েছে। একজন সহৃদয় সমঝদার বন্ধুকে কাছে পেয়ে তবু মনে একটু বল পাচ্ছি। ভাবছি, ফেরার পথে সাসেক্সে ওর কান্ট্রি হাউসে কিছুদিন কাটিয়ে যাব। ওরও তাই ইচ্ছে। সত্যি বলতে কী, বিষাক্ত গ্যাসের ফলে শরীরটাও একটু কাবু হয়েছে। সরাসরি দেশে না ফেরাই ভাল।

পরশু—অর্থাৎ ১৭ই—লাঞ্চের সময় হাম্‌বোল্টের সঙ্গে দেখা হল। খেতে বসে লক্ষ করলাম, লোকটার মেজাজটা বেশ খোশ বলে মনে হচ্ছে। তার ফলে খাওয়ার পরিমাণ আর তৃপ্তিটাও যেন বেশ বেড়ে গেছে। তার কথা শুনে বুঝলাম যে, সে 'ডী ভেল্ট' সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের শুধু তার সফল পরীক্ষার কথাই বলেনি, তাদের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে প্রাণীর—অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষের—চেহারাটাও দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। কাগজে নাকি খুব ফলাও করে হাম্‌বোল্টের কৃতিত্বের কথা লেখা হবে।

আমার পকেটে হাম্‌বোল্টের তৈরি মারণাস্ত্র ; চাকর ম্যাক্স মনিবপক্ষ ছেড়ে আমার দিকে চলে এসেছে। কাজেই আমারও খাওয়ার কোনও কমতি হল না।

অন্য সব পদ শেষ করে যখন আপেলের কাস্টার্ড খাচ্ছি, তখন হাম্‌বোল্ট হঠাৎ বলল, 'তুমি কবে দেশে ফেরার কথা ভাবছ ?'

বুঝলাম, আমার সান্নিধ্য আর হাম্‌বোল্টের পছন্দ হচ্ছে না। বললাম, 'প্রাণীটার চরম পরিণতি সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে বুঝতেই পারছ। সেটা দেখেই ফিরে যাব।'

'আই সি...'

এর পরে আর হাম্‌বোল্ট কোনও কথা বলেনি।

বিকেলে বার্চ বনে আর একটু বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আবার ল্যাবরেটরিতে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি, হাম্‌বোল্ট কাঠের চেয়ারটায় চুপটি করে বসে একদৃষ্টে ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ থেকেই আকাশে মেঘ জমছিল। এবারে দেখলাম, জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

ফ্লাস্কের ভিতরে এখনও আদিম বনে আদিম বানর ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিবর্তন কোন সময় হবে, বা আদৌ হবে কি না, সেটা জানার কোনও উপায় নেই। ঘরের কোণে একটা গোল টেবিলের উপর থেকে একটা ফরাসি পত্রিকা তুলে নিয়ে সোফায় বসে পাতা উলটোতে লাগলাম।

বৈঠকখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজার আওয়াজ পেলাম। বাইরে অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুরু হয়েছে। নেপোলিয়নটা একবার গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল।

বসে থাকতে থাকতে বোধ হয় সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে একেবারে সজাগ হয়ে উঠলাম।

হাম্‌বোল্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্কের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—তার চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট দুটো ফাঁক। আওয়াজটা তারই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে সেটাও বুঝতে পারলাম।

আমি সোফা ছেড়ে উঠে ফ্লাস্কটার দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

গিয়ে দেখি তার ভিতরে এখন সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্য, নতুন পরিবেশ। বন নেই, মাটি নেই, গাছপালা নেই, কিচ্ছু নেই। তার বদলে আছে একটা মসৃণ সমতল মেঝে, তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি এক ইঞ্চি লম্বা প্রাণী।

এই প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে বানর থেকে। অর্থাৎ এই প্রাণী হল মানুষ। কী রকম চেহারা ফ্লাস্কের এই মানুষটির ?

হাম্‌বোল্টের কম্পমান হাত থেকে মাইক্রোম্যাগ্‌নাস্কোপটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। আমি সেটাকে নিয়ে চোখে লাগাতেই প্রাণীর চেহারাটা আমার কাছে স্পষ্ট হল।

মানুষটি বয়সে বৃদ্ধ। পরনে কোট-প্যান্ট, মাথায় চুল নেই বললেই চলে, তবে দাড়ি-গোঁফ আছে, আর চোখে এক জোড়া সোনার চশমা। প্রশস্ত ললাট, চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে মেশানো একটা শান্ত সংযত ভাব।

এ লোকটাকে আমি আগে অনেকবার দেখেছি। আয়নায়। ইনি হলেন স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর একটি অতি-সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

অর্থাৎ—আমার তৈরি মানুষ দেখতে ঠিক আমারই মতন।

দেখা শেষ করে মাইক্রোম্যাগ্‌নাস্কোপটা টেবিলের উপর রেখে দেওয়া মাত্র খেয়াল হল যে, হাম্‌বোল্ট আর আমার পাশে নেই। সে হঠাৎ কোথায় যেতে পারে ভাবতে না ভাবতেই দুম দুম করে দুটো প্রচণ্ড শব্দে ল্যাবরেটরির দুটো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপরেই জানালা দুটো। বুঝলাম যে আমি বন্দি হয়ে গেলাম।

হামবোল্টের কী মতলব জানি না। পরীক্ষার সাফল্যের জন্য যে আমিই দায়ী তার এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ পেয়ে নিশ্চয়ই সে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো আমাকে হত্যা করার রাস্তা খুঁজছে সে। অস্ত্র সংগ্রহ করে হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে তবে সে দরজা খুলবে।

কী হবে যখন জানা নেই, তখন ভেবে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আমার কয়েদখানার পরিবেশটা একবার ভাল করে দেখে নিই।

একদিকে টেবিলের উপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তারমধ্যে ফ্লাস্ক, তারমধ্যে খুদে-আমি। তার ডান পাশের দেয়ালে দুটো বন্ধ দরজার মাঝখানে একটা বইয়ের আলমারি, তার পরের দেয়ালে দুটো বন্ধ জানালার মাঝখানে একটা রাইটিং ডেস্ক। অন্য দেয়ালটার সামনে সোফা, আর তার পাশে ঘরের কোণে একটা নিচু গোল টেবিল। পালাবার কোনও পথ নেই।

মনে পড়ল আমার সর্বনাশী ব্রহ্মাস্ত্র অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা গিরিডিতে রেখে এসেছি। আমার সঙ্গে হাম্‌বোল্টের পিস্তলটা রয়েছে, কিন্তু সেটাও গুলির অভাবে অকেজো। কী আর করি ? কাঠের চেয়ারটার উপর বসে ফ্লাস্কের ভিতরে আশ্চর্য প্রাণীটার দিকে মন দিলাম।

খুদে শঙ্কু কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর দেখলাম হাত দুটোকে পিছনে করে পায়চারি আরম্ভ করল। মনে পড়ল আমিও চিন্তিত হলে ঠিক এইভাবেই পায়চারি করি। দৃশ্যটা আমাকে আবার এমন অবাক করে তুলল যে আমি আমার বিপদের কথা প্রায় ভুলেই

www.BDeBooks.Com

গেলাম।

কতক্ষণ এইভাবে তন্ময় হয়ে ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ খেয়াল হল যে আমার দৃষ্টি কেমন জানি ঝাপসা হয়ে আসছে। তারপর বুঝতে পারলাম যে সেটার কারণ আর কিছুই না—কোথা থেকে জানি ঘরের মধ্যে একটা বাষ্প জাতীয় কিছু ঢুকছে। একটা তীব্র বিশ্রী গন্ধ নাকে এসে প্রবেশ করছে।

চারিদিকে আর একবার ভাল করে দেখে অবশেষে বুঝতে পারলাম, কোথা দিয়ে এই গ্যাসটা আসছে। ল্যাবরেটরির দূষিত বায়ু বাইরে যাবার জন্য একটা চিমনি রয়েছে টেবিলটার পিছন দিকে। সেটা চলে গেছে বাড়ির ছাত অবধি। সেই চিমনির মুখটা দিয়েই এই দুর্গন্ধ গ্যাস ঘরে এসে ঢুকছে।

আমি নাকে রুমাল চাপা দিলাম। গ্যাস ক্রমে বাড়ছে। সবুজ ধোঁয়ায় ঘর ক্রমে ছেয়ে যাচ্ছে। আমার চোখে অসহ্য জ্বালা। নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। তার মধ্যেই বুঝতে পারছি এটা সেই সাংঘাতিক কার্বোডিমন গ্যাস—যাতে মানুষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবি খেয়ে দম আটকিয়ে মরে যায়।

আমি আর চেয়ারে বসে থাকতে পারছিলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। রুমালে কোনও কাজ দিচ্ছে না। ঘরের যন্ত্রপাতি টেবিল চেয়ার, এমনকী আমার সামনে ফ্লাস্কটা পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে আসছে। একটা অন্ধকার পরদা নেমে আসছে আমার সামনে। আমি দাঁড়িয়েও থাকতে পারছি না। আমার সামনে টেবিল। আমি টেবিলের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার বেড়ালের কথা মনে হচ্ছে...প্রহ্লাদ...গিরিডি...আমার বাগান...গোলঞ্চ গাছ...অবিনাশবাবু....

কী যেন একটা ঝলসে উঠল আমার চোখের সামনে। এক বিঘতের মধ্যে। সেই ঝলসানিতে স্পষ্ট দেখলাম ফ্লাস্কটা। তাতে আর খুদে-শঙ্কু নেই। তার জায়গায় পর পর তিনবার বৈদ্যুতিক স্পার্ক খেলে গেল। বুঝলাম আমি আমার দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছি, শরীরে বল পাচ্ছি, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি। ঘরের ভিতর থেকে গ্যাস দূরীভূত হচ্ছে, দুর্গন্ধ চলে যাচ্ছে, ধোঁয়াটে ভাবটা ক্রমশ কমে আসছে। আমার অবাক দৃষ্টি এখনও ফ্লাস্কের ভিতর। পরিবেশ বদলে গেছে। সিমেন্টের বদলে এখন একটা স্বচ্ছ কাচ কিংবা প্লাস্টিকের মাঝে যেখানে স্পার্ক হচ্ছিল, সেখানে এখন নতুন প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

এমন প্রাণী আমি জীবনে কখনও দেখিনি। লম্বায় দু'ইঞ্চির বেশি নয়, তার মধ্যে মাথাটাই এক ইঞ্চি। শরীরে রামধনু রঙের পোশাকটা পা থেকে গলা অবধি গায়ের সঙ্গে সাঁটা। নাক কান ঠোঁট বলতে কিছুই নেই। চোখ দুটো জ্বলন্ত অথচ স্নিগ্ধ আগুনের ভাঁটা। মাথা জোড়া মসৃণ সোনালি টাক। হাত দুটো কনুইয়ের কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। তাতে আঙুল আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে ভাল করে প্রাণীটাকে দেখব, এমন সময় ঘরের একটা দরজা খুলে গেল।

হাম্‌বোল্ট, আর তার পিছনে তার গ্রেট ডেন হাউন্ড নেপোলিয়ন।

হাম্‌বোল্ট আমাকে দেখেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। বোঝাই গেল, সে আমাকে জ্যান্ত দেখতে পাবে সেটা আশাই করেনি।

'গ্যাস ? গ্যাস কী হল ?' সে বোকার মতো বলে উঠল।

আমি বললাম, 'আপনা থেকেই উবে গেছে।'

'সুঃ নেপোলিয়ন !'

হাম্‌বোল্ট এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর ওই বিশাল কুকুরটা একটা হিংস্র গর্জন করে দাঁত

খিঁচিয়ে একটা লম্ফ দিল আমাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাল না। শূন্যে থাকা অবস্থাতেই একটা তীব্র রশ্মি এসে তার গায়ে লেগে তাকে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী করে দিল। রশ্মিটা এসেছে ফ্লাস্কের ভিতর থেকে।

এবার হাম্‌বোল্ট 'নেপোলিয়ান !' বলে একটা চিৎকার দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে কুকুরটার দিকে একবার দেখে টেবিলের উপর থেকে একটা মারাত্মক অ্যাসিডের বোতল তুলে নিয়ে সেটা আমার দিকে উঁচিয়ে তুলতেই তারও তার কুকুরের দশাই হল। ফ্লাস্কের ভিতর সদ্যোজাত অদ্ভুত প্রাণীটা ওই বিরাট জার্মান বৈজ্ঞানিককেও তার আশ্চর্য রশ্মির সাহায্যে নিমেষে ঘায়েল করল।

হাম্‌বোল্ট এখন তার পোষা কুকুরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পরীক্ষা করে দেখলাম, দুজনের একজনও মরেনি, কেবল সম্পূর্ণভাবে অচেতন।

এই ঘটনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সামারভিল এসে হাজির। সব শুনেটুনে সে বলল, 'হাম্‌বোল্ট প্রায় বছর দশেক উন্মাদ অবস্থায় গারদে কাটিয়েছিল, তারপর ভাল হয়ে ছাড়া পায়, কিন্তু সেই সময় থেকেই বৈজ্ঞানিক মহলে তার সমাদর কমে যায়। গত কয়েক বছর ধরে যেখানে সেখানে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে সে আমন্ত্রিত না হয়েও গিয়ে হাজির হয়েছে। পাছে আবার পাগলামিগুলো দেখা দেয়, তাই ওকে আর কেউ ঘাঁটায় না। তুমি ব্যাপারটা জানতে না শুনে আমার আশ্চর্য লাগছে। সেদিনই তোমাকে টেলিফোনে সাবধান করে দিতাম, কিন্তু লাইনটা কেটে গেল। তাই ভাবলাম, নিজেই চলে আসি।'

দোতলায় আমার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে এই সব কথা হচ্ছিল। হাম্‌বোল্ট ও তার কুকুরকে তাদের উপযুক্ত দুটি আলাদা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের শক্ লেগেছে মস্তিষ্কে। কতদিনে সারবে বলা যায় না।

www.BDeBooks.Com

সামারভিল এসেই ফ্লাস্কের আশ্চর্য প্রাণীটাকে দেখেছিল। দুজনেই বুঝেছিলাম যে, এটাই হল মানুষের পরের অবস্থা ; যদিও কত হাজার বা কত লক্ষ বছর পরে মানুষ এ চেহারা নেবে সেটা জানার উপায় নেই।

কফি খাওয়া শেষ করে আমরা দুজনেই স্থির করলাম যে খুদে-সুপারম্যান বা অতি-মানুষটি কী অবস্থায় আছে একবার দেখে আসা যাক। ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই আবার একটা অপ্রত্যাশিত অবাক দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল।

সমস্ত ফ্লাস্কের ভিতরটা এখন একটা লালচে আভায় ভরে আছে। সূর্যাস্তের পর মাঝে মাঝে আকাশটা যে রকম একটা বিষণ্ণ আলোয় ভরে যায়, এ যেন সেই আলো। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মেঝের বদলে এখন দেখতে পেলাম বালি, আর সেই বালির উপর একটা চ্যাপটা আঙুরের মতো জিনিস নির্জীবভাবে পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, তার মধ্যে একটা মৃদু স্পন্দনের আভাস লক্ষ করা যাচ্ছে।

এটাও কি প্রাণী ? এটাও কি মানুষের আরও পরের একটা অবস্থা ? যে অবস্থায় মানুষের উত্তরপুরুষ একটা মাংসপিণ্ডের মতো মাটিতে পড়ে থাকবে, তার হাত থাকবে না পা থাকবে না, চলবার, কাজ করবার, চিন্তা করবার শক্তি থাকবে না, কেবল দুটি প্রকাণ্ড চোখ দিয়ে সে পৃথিবীর শেষ অবস্থাটা ক্লান্তভাবে চেয়ে চেয়ে দেখবে ?

সামারভিল বলল, 'এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি না শঙ্কু। একটা কিছু করো।'

কিন্তু কিছু করতে আর হল না। আমরা দেখতে দেখতেই চোখের সামনে একটা ক্ষীণ বাঁশির মতো শব্দের সঙ্গে সেই আলো, সেই বালি আর সেই মাংসপিণ্ড, সব কিছু মিলিয়ে গিয়ে ক্রমবিবর্তনের শেষ পর্ব শেষ হয়ে পড়ে রইল শুধু একটি কাচের ফ্লাস্ক আর তার সামনে দাঁড়ানো দুটি হতভম্ব বৈজ্ঞানিক !

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭৮

মরুরহস্য

১০ই জানুয়ারি

নতুন বছরের প্রথম মাসেই একটা দুঃসংবাদ। ডিমেট্রিয়াস উধাও ! প্রোফেসর হেক্টর ডিমেট্রিয়াস, বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের রাজধানী ইরাক্লিয়ন শহরের অধিবাসী ছিলেন ডিমেট্রিয়াস। আমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, তবে পত্রালাপ হয়েছে বছর তিনেক আগে। ভদ্রলোক প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন জানতে পেরে আমি আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কিছু খবর দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি পাওয়ামাত্র ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দেন। মুক্তোর মতো ইংরিজি হাতের লেখা, ভাষার উপরেও আশ্চর্য দখল। পরে আমার বন্ধু প্রোফেসর সামারভিলের কাছে জানতে পারি, ডিমেট্রিয়াস নাকি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কাল সামারভিলের চিঠিতেই ভদ্রলোকের নিরুদ্দেশের খবরটা পাই। চিঠি থেকে যা জানা গেল তা মোটামুটি এই—

গত ৪ঠা জানুয়ারি সকাল আটটার সময় প্রোফেসর ডিমেট্রিয়াস একটা সুটকেস হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যান। তাঁর চাকর তাঁকে বেরোতে দেখেছিল, কিন্তু মনিব কোথায় যাচ্ছেন, সে খবর তার জানা ছিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভদ্রলোক বাড়ি না ফেরায় চাকর পুলিশে খবর দেয়। তদন্তে জানা যায় প্রোফেসর ডিমেট্রিয়াস নাকি একটা ট্যাক্সি করে ইরাক্লিয়ন বিমানবন্দরে যান। সেখান থেকে সকাল সাড়ে দশটার সময় তিনি একটি প্লেন ধরেন। সে প্লেন যায় কায়রোতে। কায়রোতে খবর করে জানা যায়, তিনি নাকি আলহাম্‌ব্রা হোটেলে উঠেছিলেন, এবং মাত্র একরাত সেখানে থাকেন। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

চিঠিটা সামারভিল লিখেছেন ইরাক্লিয়ন থেকে। ডিমেট্রিয়াসের বন্ধু ছিল সামারভিল। এথেন্‌সে একটা বক্তৃতা দিতে এসেছিল। এমনিতেই মতলব ছিল বক্তৃতার পর একবার ক্রীটে ঘুরে যাবে। এথেন্‌সে থাকতে থাকতেই সংবাদপত্রে ডিমেট্রিয়াসের অন্তর্ধানের খবর পেয়ে অন্য কাজ ফেলে সোজা ইরাক্লিয়নে চলে যায়। এখন ও নিজেই তদন্ত চালাবে বলে স্থির করেছে। ওকে সাহায্য করবার জন্য আমায় ডাকছে। গ্রীসে গেছি এর আগে দু'বার, কিন্তু ক্রীটটা যাওয়া হয়নি। মনটা উড়ু উড়ু করছে, হাতে বিশেষ কাজও নেই, তাই ভাবছি ঘুরে আসি।

১৪ই জানুয়ারি

আজ সকালে ইরাক্লিয়ন এসে পৌঁছেছি। শহর থেকে তিন মাইল দূরে সাইলোরিটি পাহাড়ের ঠিক পায়ের কাছে ডিমেট্রিয়াসের বাড়ি। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ; কিন্তু সেটা উপভোগ করার সময় এটা নয়। সামারভিল বেশ চিন্তিত, এবং তার চিন্তার কারণও আছে যথেষ্ট। প্রথমত, কায়রোতে অনুসন্ধান করেও আর কোনও খবর আসেনি। দ্বিতীয়ত, ডিমেট্রিয়াসের এভাবে না বলে ক'য়ে চলে যাবার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর ল্যাবরেটরিতে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেও ইদানীং তিনি কী বিষয়ে গবেষণা করছিলেন তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাঁর একটা সবুজ রঙের খাতা পাওয়া গেছে যেটা মনে হয় তিনি সম্প্রতি ব্যবহার করেছিলেন। তাতে লেখা আছে বিস্তর, কিন্তু সে লেখার জন্য এমন এক উদ্ভট ভাষা ও উদ্ভট অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, যার কূলকিনারা করা সম্ভব হয়নি। আমি নিজেও সে খাতাটা দেখেছি এবং তার লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি। একেকটা অক্ষর হঠাৎ দেখে ইংরিজি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। ভাষাটা সাংকেতিক হতে পারে কি না জিজ্ঞেস করাতে সামারভিল বলল, 'কিছুই আশ্চর্য নয়। ওর ভাষা সম্পর্কে একটা বিশেষ কৌতূহল ছিল। "লিনিয়ার এ"-র ব্যাপারটা তুমি জান কি ?'

আমি জানতাম খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার শতাব্দীতে ক্রীট দেশে যে ভাষা পাথরে খোদাই করে লেখা হত, তার নাম আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকরা দিয়েছেন লিনিয়ার-এ। সামারভিল বলল এই ভাষা নিয়ে ডিমেট্রিয়াস নাকি বেশ কিছুদিন থেকে চর্চা করছেন। হয়তো এই খাতায় প্রাচীন শিলালিপি থেকে পাওয়া কোনও মূল্যবান তথ্যের বর্ণনা রয়েছে। ডিমেট্রিয়াসের চাকর মিখাইলি বলছিল যে তার মনিব নাকি সম্প্রতি প্রায়ই ইরাক্লিয়ন ছেড়ে ক্রীটের অন্যান্য প্রাচীন শহরে চলে যেতেন, এবং সেখানে পাঁচ-সাত দিন করে থেকে পাথরের টুকরো ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতেন। এইসব পাথরের টুকরো অনেকগুলিই অবশ্য বৈঠকখানায় ও ল্যাবরেটরিতে আমরা দেখেছি।

www.BDeBooks.Com

মিখাইলির আর একটা কথাতেও সামারভিল বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। যে দিন ডিমেট্রিয়াস চলে যায়, তার আগের দিনই নাকি সন্ধ্যাবেলা মিখাইলি একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায়। সেটা আসে পিছনের পাহাড়ের দিক থেকে। ডিমেট্রিয়াস তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু ফিরে আসেন তার ঠিক দশ মিনিট পরেই। ডিমেট্রিয়াসের নিজের একটা বন্দুক ছিল, যদিও সেটা বহুকাল ব্যবহার হয়নি। সে বন্দুক নাকি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মিখাইলির একটা ছেলে আছে, বছরদশেক বয়স। ভারী চালাকচতুর। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না জানি না, কিন্তু সে বলে যে যেদিন সন্ধ্যায় বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়, সেদিন নাকি সে দুপুরবেলা জঙ্গলের দিক থেকে বাঘের গর্জন শুনেছিল। আমি জানি ক্রীট দ্বীপে কস্মিন কালেও বাঘ থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং এ ছোকরা গর্জন শুনে চিনল কী করে? জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি একগাল হেসে বলল যে ইরাক্লিয়নে সার্কাস এসেছিল, সেই সার্কাসে সে নাকি বাঘের গর্জন শুনেছে। কথাটা মিথ্যে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। মোট কথা সব মিলিয়ে বেশ গোলমেলে ব্যাপার।

আমরা ঠিক করেছি দুপুরের খাওয়া সেরে একবার পাহাড়ের দিকটা ঘুরে আসব। ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওদিকটায় ঘন ঝাউবন। যদি কিছু ঘটে থাকে তো ওই বনের মধ্যেই ঘটেছে।

১৫ই জানুয়ারি

ইরাক্লিয়ন এয়ারপোর্টের রেস্টুর‍্যান্টে বসে ডায়রি লিখছি। কায়রোর প্লেন ছাড়তে নাকি ঘণ্টাখানেক লেট হবে, তাই এই ফাঁকে কালকের অদ্ভুত ঘটনাটা লিখে রাখি।

কাল লাঞ্চ সেরে প্রায় দুটো নাগাদ আমি আর সামারভিল পাহাড়ের গায়ে ঝাউবনের ভিতরটা একটু এক্সপ্লোর করতে বেরোলাম। বাড়ির পিছনে একটা পাতিলেবুর বাগান, সেটা পেরিয়েই পাহাড়ের চড়াই শুরু হয়।

ঝাউবনের ভিতর দিয়ে মিনিটদশেক হাঁটার পর, চোখে কিছু না দেখতে পেলেও, নাকে যেন একটা চেনা গন্ধ পাচ্ছি বলে মনে হল। সামারভিলের সর্দি হয়েছে, এত দূর থেকে সে গন্ধ পাবে না জানি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে একশো গজের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মরা জানোয়ার টানোয়ার কিছু পড়ে আছে। আমি গন্ধের দিকে এগোতে লাগলাম, সামারভিল আমার পিছনে। ক্রমে সামারভিলের নাকেও গন্ধটা প্রবেশ করল। সে ফিস ফিস করে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সশস্ত্র?' আমি কোটের বুকপকেট থেকে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে তাকে দেখিয়ে দিলাম। মৃত জানোয়ারের আশেপাশে কোনও জ্যান্ত জানোয়ার লুকিয়ে থাকতে পারে, এটাই বোধ হয় আশঙ্কা করছিল সামারভিল।

আমরা অতি সন্তর্পণে চারিদিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম।

সামারভিলের দৃষ্টিই প্রথম গেল শকুনিগুলোর দিকে। ঝাউবনের মাঝখানে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় আট-দশটা শকুনি মিলে একটা কালো মরা জানোয়ারের মাংস খাচ্ছে। ব্যাপারটা ঘটছে অন্তত ত্রিশ হাত দূরে—কাজেই জানোয়ারটা যে কী সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। আরও কয়েক পা এগোতেই আমার চোখ হঠাৎ চলে গেল মাটির দিকে। আমাদের পায়ের ঠিক সামনে সাদা বুনো ফুলের একটা ঝোপের পাশেই পড়ে আছে এক চাবড়া কুচকুচে কালো লোম।

'ভাল্লুক?'

প্রশ্নটা আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'মোস্ট আনলাইক্‌লি', সামারভিল মন্তব্য করল। আমিও জানি, এ তল্লাটে ভাল্লুক থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই।

সামারভিল ইতিমধ্যে এক গোছা কালো লোম হাতে তুলে নিয়েছে। লক্ষ করলাম লোমগুলো প্রায় এক বিঘত লম্বা এবং অস্বাভাবিক রকম রুক্ষ।

আরও দশ পা এগোতেই জানোয়ারের মাথার দিকটা চোখে পড়ল। যদিও মাথার খানিকটা অংশ শকুনিরা খুবলে খেয়ে নিয়েছে, তবু সেটা যে ব্যাঘ্র শ্রেণীর কোনও জানোয়ার, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে একটা শকুনি ডানা ঝটপটিয়ে লাফিয়ে এক পাশে সরে যাওয়াতে জানোয়ারের শরীরের আরও খানিকটা অংশ দেখা গেল। পাঁজরার হাড়, ও তারই আশেপাশে লেগে থাকা মাংস আর ঘন কালো লোমে ঢাকা চামড়া। শকুনিগুলো দিব্যি ভোজ মেরে চলেছে। ক্রীট দ্বীপে প্যান্‌থার বা ওই জাতীয় কোনও জানোয়ারের মাংস কি এরা কোনওদিন খেয়েছে? মনে তো হয় না। প্যান্‌থার কথাটা যদিও ব্যবহার করছি, কিন্তু আমি জানি যে কস্মিন কালেও কোনও প্যান্‌থারের লোম এত বড় বা এত রুক্ষ হয় না।

সামারভিলও অগত্যা বলল, 'ব্যাঘ্র শ্রেণীর একটি আনকোরা নতুন জানোয়ার—এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে।'

'কিন্তু এটাকেই কি বন্দুক দিয়ে মারা হয়েছিল?'

'তাই তো মনে হয়; তবে ডিমেট্রিয়াস মেরেছিলেন কি না সেটাই প্রশ্ন।'

বাড়ি ফিরে এসে মিখাইলিকে জন্তুটার কথা বলতে সে অবাক হয়ে গেল। 'কালো জন্তু? বাঘের মতো দেখতে? এক কালো বেড়াল আর কালো কুকুর ছাড়া আর কোনও কালো জন্তু এদিকটায় কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

সন্ধ্যাবেলা ডিমেট্রিয়াসের শোবার ঘরের রাইটিং ডেস্ক থেকে একটা মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল। সেটা হল একটা ডায়রি। চামড়ায় বাঁধানো ঝকঝকে নতুন ডায়রি, তাতে জানুয়ারি মাসের ২রা এবং ৩রা তারিখের পাতায় ডিমেট্রিয়াসের হাতে গ্রীক ভাষায় লেখা দুটো মন্তব্য রয়েছে। আমরা দুজনে মিলে সে দুটোর মানে করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সামান্য হলেও, সে লেখা যেমন রহস্যময় তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। ২রা জানুয়ারির লেখাটা বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

'আমার জীবনে সব সময়ই দেখেছি যে আনন্দের কারণ এবং উদ্বেগের কারণ একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘোরাফেরা করে। তাই সাফল্যেও শান্তি নেই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হাত দেব না। যাই হোক, আমার এই ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে। বাবার বন্দুকটা বার করতে হবে। সেই ছেলেবেলায় এয়ারগান ছুড়েছি, ভাল টিপ ছিল। এখনও আছে কি?'

'বাবার বন্দুক' সম্বন্ধে সামারভিলকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল ডিমেট্রিয়াসের বাবা নাকি বিখ্যাত শিকারি ও পর্যটক ছিলেন, এবং আফ্রিকার জঙ্গলে নাকি বিস্তর ঘোরাফেরা করেছেন। এখন বুঝতে পারছি, বৈঠকখানার মেঝেতে পাতা সিংহের ছালটা কোত্থেকে এসেছে। ৩রা জানুয়ারির পাতায় লেখা—

'ক্‌নোসস্‌ শহরের সেই মেলায় আজ থেকে দশ বছর আগে এক বেদে বুড়ি আমার ভবিষ্যৎ বলেছিল। তার মতে আমার পঁয়ষট্টি বছরের জন্মতিথিতে নাকি একটা মস্ত বড় ফাঁড়া আছে, সেটা নাকি কাটানো মুশকিল হবে। পঁয়ষট্টি হতে আর মাত্র ১৬ দিন বাকি। অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারি। বুড়ির অন্য ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো সবই ফলেছে, তাই এটাও ফলবে বলে মেনে নিতে পারি। হয়তো আমি যে পরীক্ষাটা করতে যাচ্ছি তাতেই আমার মৃত্যু

www.BDeBooks.Com

হবে। হয় হোক। যদি মরার আগে পরীক্ষায় সফল হতে পারি তা হলে মরতে কোনও আপশোস নেই। কিন্তু এই জনবহুল ক্ষুদ্রায়তন ক্রীট দ্বীপ আমার পরীক্ষার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত জায়গা নয়। আমার চাই বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। আমার চাই—সাহারা।'

'সাহারা' কথাটার তলায় দুবার মোটা করে লাইন টানা আছে। কায়রো যাবার কারণটা এ থেকে পরিষ্কার হচ্ছে ; কিন্তু পরীক্ষাটা যে কী এবং তার জন্য মরুভূমির কেন প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। দেখি কায়রোয় গিয়ে যদি কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

১৫ই জানুয়ারি বিকেল ৫টা

কায়রো। আমরা দুজনে আল্‌হাম্‌ব্রা হোটেলেই উঠেছি। হোটেলের খাতায় নাম লেখার সময় ডিমেট্রিয়াসের নামটাও চোখে পড়ল। ৪ঠা জানুয়ারি সে যে সত্যিই এই হোটেলে এসে উঠেছিল, তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। নামটা দেখেই সামারভিল একটা পাকা গোয়েন্দার মতো কাজ করে ফেলল ; ডিমেট্রিয়াস যে ঘরে ছিলেন—অর্থাৎ ৩১৩ নম্বর ঘর—সেই ঘরটাই আমাদের থাকার জন্য চেয়ে বসল। সৌভাগ্যক্রমে ঘরটা খালিই ছিল, কাজেই পেতে অসুবিধা হল না। সে ঘরে ডিমেট্রিয়াসের কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে এটা আশা করা বৃথা, কারণ গত এগারো দিনে অনেকেই সে ঘরে থেকে গেছে এবং অনেকবারই সে ঘর ঝাড়পোঁছ হয়েছে। কিন্তু তাও দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত লাভই হল। এ ঘরের যে রুমবয়—অর্থাৎ যে ছোকরাটি কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিছানাপত্র গোছগাছ করে দিয়ে গেল—তার সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। সামারভিলই প্রথম প্রশ্ন করল ছেলেটিকে।

'কদ্দিন কাজ করছ এ হোটেলে ?'

'চার বছর।'

'এ ঘরে যারা এসে দু'একদিন থেকে চলে যায়, তাদের কথা মনে থাকে তোমার ?'

'যারা যাবার সময় ভাল বকশিশ দেয়, তাদের কথা মনে থাকে বই কী।'

বুঝলাম ছোকরা বেশ রসিক। সামারভিল বলল, 'দিনদশেক আগে একজন গ্রিক ভদ্রলোক এ ঘরে এসে এক রাত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক। সঙ্গে একটা কালো সুটকেস। পাঁচ ফুটের বেশি হাইট নয় ভদ্রলোকের। বছর পঁয়ষট্টি বয়স, মাথায় টাক, যেটুকু চুল আছে কাঁচা, ঘন কালো ভুরু, টিকোলো নাক—মনে পড়ছে ?'

ডিমেট্রিয়াসকে যদিও দেখিনি, ইরাক্লিয়নে তার বাড়ির বৈঠকখানায় ম্যান্‌টলপিসে তার একটা বাঁধানো ফোটো দেখে তার চেহারাটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

রুমবয় হেসে বলল, 'পঁচাত্তর পিয়াস্ত্র বকশিশ দিয়ে গেলেন, থাকবে না মনে ?'

পঁচাত্তর পিয়াস্ত্র মানে পনেরো টাকা। রুমবয়ের খুশি হবারই কথা।

'ভদ্রলোক তো মাত্র এক রাত ছিলেন, তাই না ?' সামারভিল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ ; আর তার মধ্যেও বেশির ভাগ সময় তাঁর দরজার বাইরে "ডু নট ডিস্টার্ব" নোটিশ টাঙানো থাকত।'

'এখান থেকে উনি কোথায় যাবেন, সেটা কিছু বলেছিলেন কি ?'

'আমাকে উটের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বললেন উটের পিঠে চড়ে মরুভূমিতে যাবেন, উট কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়। আমি বললাম এল্ গিজা থেকে ক্যারাভ্যানের রাস্তা আছে—হাজার মাইল চলে গেছে মরুভূমির মধ্য দিয়ে। এল্ গিজায় গেলে উট ভাড়া পাওয়া

যাবে।'

রুমবয়ের কাছ থেকে এর বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে গিজার খবরটা জরুরি। নাইল নদীর পূর্ব দিকে কায়রো শহর, আর ব্রিজ পেরিয়ে পশ্চিমে হল গিজা—বিখ্যাত পিরামিড ও স্ফিঙ্কসের জায়গা। গিজা আমার আগেই দেখা ছিল, যদিও ক্যারাভ্যানের রাস্তা ধরে উটের পিঠে চড়ে মরু অভিযানের অভিজ্ঞতা আমার নেই। আজকের দিনটা কায়রো শহরে ডিমেট্রিয়াস সম্বন্ধে আরেকটু খোঁজখবর করে কাল সকালে গিজায় যাব স্থির করলাম।

১৬ই জানুয়ারি, দুপুর সাড়ে বারোটা

প্রায় পাঁচশো উটের একটা ক্যারাভ্যানের সঙ্গে আমরা চলেছি মরুপথ দিয়ে বাহারিয়া ওয়েসিসের রাস্তায়। যাত্রীদের সকলেই ব্যবসাদার—শহরে তৈরি পশমের জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এরা বাণিজ্য করতে চলেছে গভীর মরুদেশের গ্রামাঞ্চলে। এই সব জিনিসের বদলে ওরা নিয়ে আসবে প্রধানত খেজুর। এই বাণিজ্য চলে আসছে একেবারে আদ্যিকাল থেকে।

দশ মিনিট হল আমরা একটা মরূদ্যান বা ওয়েসিসের ধারে থেমেছি বিশ্রামের জন্য। এ অঞ্চলটা একটা উপত্যকা। দিগন্ত বিস্তৃত বালির ফাঁকে ফাঁকে চুনা পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। আমাদের কাছেই একটা জলাশয়, আর সেটাকে ঘিরে কয়েকটা খেজুরগাছ আর বেদুইনদের তাঁবু। এ ছাড়া রয়েছে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা। জলাশয়ের ওপারে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা বোধ হয় একটা মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। আমার পাশেই রয়েছে একটা মাথাভাঙা থাম, সেটার ছায়ায় বসে আমি ডায়রি লিখছি।

আমরা হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি সকাল সাড়ে সাতটায়। গিজা পৌঁছোতে লাগল আধ ঘণ্টা। যেখানে উট ভাড়া করলাম, তার কাছেই রাস্তার ধারে এক সারি দোকান, তার মধ্যে এক বৃদ্ধ খেজুরবিক্রেতার কাছে ডিমেট্রিয়াসের খবর পাওয়া গেল। আমি আরবি ভাষা জানি, তাই একে ওকে ডিমেট্রিয়াসের বর্ণনা দিয়ে তাকে দেখেছে কি না জিজ্ঞেস করছিলাম। তাদের মধ্যে একজন ওই বুড়ো ফলওয়ালাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, ও জানতে পারে।' খেজুরওয়ালাকে প্রশ্ন করতেই সে হাত নেড়ে চোখ রাঙিয়ে অকথ্য ভাষায় ডিমেট্রিয়াসকে উদ্দেশ করে গাল পাড়তে লাগল। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করাতে শেষটায় বলল, ডিমেট্রিয়াস তার কাছ থেকে খেজুর কিনে যে পয়সা দিয়েছিল, তারমধ্যে নাকি দুটো গ্রিক লেপ্‌টা ছিল। বুড়ো চোখে ভাল দেখে না, তাই বুঝতে পারেনি। পরে জানতে পেরে খোঁজ করে দেখে সাহেব উধাও। শেষপর্যন্ত তার বাক্যস্রোত বন্ধ করার জন্য সামারভিল তাকে স্থানীয় পয়সা দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করল। বুঝতে পারছি গিজায় এসে ভুল করিনি। ডিমেট্রিয়াস এখান থেকেই উট নিয়ে মরুভূমির উদ্দেশে যাত্রা করেছে। কিন্তু সে কি যাত্রীদলের সঙ্গেই গেছে, না মাঝপথে মোড় ঘুরে নিজের খেয়াল মতো রাস্তা নিয়েছে?

আমি সঙ্গে করে আমার খিদে মেটানো বড়ি—বটিকা ইন্ডিকা—নিয়েছি পনেরো দিনের মতো। আশা করি তার মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, এবং আশা করি ডিমেট্রিয়াসকে আমরা জীবিত অবস্থাতেই পাব। বেদেবুড়ির কথাটা জেনে অবধি মনটা খচ খচ করছে। এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ফলে যায় সেটা আমিও দেখেছি। যদিও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে এর কারণ এখনও স্থির করতে পারিনি। ১৯শে জানুয়ারি ডিমেট্রিয়াসের জন্মতিথি। আর ওই একই দিন ওর ফাঁড়া। আজ হল ১৬ই...

www.BDeBooks.Com

১৭ই জানুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

আমার থারমোমিটার বলছে কনকনে শীত—অর্থাৎ একত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট—কিন্তু এয়ার কন্ডিশনিং পিল ব্যবহার করার জন্য আমরা দুজনেই সাধারণ সুতোর পোশাকে চালিয়ে নিতে পারছি।

কতখানি পথ এসেছি এই ছত্রিশ ঘণ্টায় জানি না। আন্দাজে মনে হয় শ'খানেক মাইল হবে। আজকের মতো আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। রাতটা বিশ্রাম করে কাল সকালে আবার রওনা দেব। মরুযাত্রীর দল ধুনি জ্বালিয়ে তাঁবু ফেলে বসেছে। উটগুলো ঘাড় উঁচু করে গম্ভীরভাবে জাবর কাটছে, আর মাঝে মাঝে হ্রেষাধ্বনির মতো বিকট শব্দ করছে। শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একবার মনে হল, একটা হায়নার হাসি শুনলাম। পথে আসার সময় ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে খরগোশ আর একরকম ধাড়ি ইঁদুর মাঝে মাঝে বেরোতে দেখা যায়। সাপ এখনও চোখে পড়েনি। দিনের আকাশে বাজ আর চিল উড়তে দেখেছি। এ ছাড়া আর কোনও পাখি নজরে পড়েনি।

আমাদের তাঁবু আমরা সঙ্গেই এনেছি। আপাতত তার ভিতরে বসে আমরা দুজনে আমারই তৈরি লুমিনিম্যাক্স আলোর সাহায্যে কাজ করছি। ন্যাপথালিনের বলের মতো দেখতে এই আলোয় দেশলাই সংযোগ করলেই প্রায় দুশো ওয়াট পাওয়ারের আলো বেরোয়। একটা বলে এক রাতের কাজ চলে। সঙ্গে স্টক্ আছে যথেষ্ট।

আজ বিকেল চারটে নাগাদ পথে যে ঘটনাটা ঘটল, এবার সেটার কথা বলি।

আজ সারা দুপুরই আবহাওয়াটা বেশ গুমোট ছিল— যদিও গরম নয় মোটেই। গুমোট ভাব দেখে, এবং পশ্চিমের আকাশে খানিকটা মেঘ জমেছে দেখে, আমি তো ভাবছিলাম হয়তো বা বৃষ্টি হবে, কারণ এখানে বছরে যে তিন-চার দিন বৃষ্টি হয়, সেটা শীতকালে হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বৃষ্টি হল না। তার বদলে যে দিকে মেঘ জমেছিল, সে দিক থেকে একটা হাওয়া দিতে শুরু করল, আর সেই হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানে একটা শব্দ ভেসে এল। শব্দটা এই মরুভূমির পরিবেশে যেমন অদ্ভুত তেমনই অপ্রত্যাশিত। দুম্—ধুপ্... দুম্—ধুপ্...দুম্—ধুপ্...। যেন কোথাও একটা অতিকায় দামামায় তালে তালে ঘা পড়েছে! শব্দটা এতই গম্ভীর যে তেমন আওয়াজ বার করতে হলে দামামার আয়তন হওয়া উচিত অন্তত একখানা পিরামিডের সমান।

কিছুক্ষণ চলার পরেই বুঝলাম যে শব্দটা শুধু আমার কানেই পৌঁছায়নি; যাত্রীদের অনেকেই সেটা শুনেছে, এবং তার ফলে তাদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মানুষ নয়— উটের মধ্যেও যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করলাম। গোটা দশেক উট তো যাত্রীসমেত ল্যাগব্যাগ করে বালির উপর বসেই পড়ল। এদিকে বাতাস বয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে শব্দও হয়ে চলেছে— দুম্—ধুপ...দুম্—ধুপ্...দুম্—ধুপ্...। হিসেব করে দেখলাম যে, প্রথম দুটো আঘাতের মাঝখানে তিন সেকেন্ডের তফাত, আর তারপর পাঁচ সেকেন্ডের একটা ফাঁক। এই ভাবেই, এই ছন্দেই, ক্রমাগত হয়ে চলেছে শব্দটা।

আমরা দুজনেই উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লাম। সামারভিলকে বললাম, 'কী বুঝছ?' সামারভিল কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বলল, 'আওয়াজটা মনে হয় মাটির তলা থেকে আসছে।' আমারও সেই রকমই মনে হচ্ছিল। শব্দটায় তেজ আছে, গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু স্পষ্টতার অভাব। সেটা যে কত দূর থেকে আসছে তাও বোঝার কোনও উপায় নেই। এদিকে যাত্রীদের মধ্যে বেজায় শোরগোল পড়ে গেছে। একটি বুড়ো পশমওয়ালা— তার গায়ের রং তামাটে আর মুখে অসংখ্য বলিরেখা— আমার কাছে এসে দানব দৈত্যের কথা

বলতে লাগল ; একেবারে খাস আরব্যোপন্যাসের কাহিনী। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সে আমাদেরই দুজনকে অপয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একটা বিশ্রী প্রপাগান্ডা শুরু করে দিল। প্রায় সাত-আটশো লোক, হঠাৎ যদি তাদের মাথায় ঢোকে যে, আমরা দুজন তাদের যাত্রাপথে অমঙ্গলের সূচনা করছি, তা হলে আর রক্ষা নেই।

এদিকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে হাওয়াটা কমে আসছে, এবং সেই সঙ্গে শব্দটাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম যে এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করা চলবে না। শব্দের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে তারস্বরে একটার পর একটা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক আওড়াতে শুরু করলাম। পাঁচ নম্বর শ্লোকের মাঝামাঝি এসে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে শব্দটাও। বলা বাহুল্য, এরপর যাত্রীদের মধ্যে কেউ আর আমাদের পিছনে লাগতে আসেনি।

কিন্তু এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে শব্দটা আমাদের দুজনকেও ভারী অবাক করে দিয়েছে। অবিশ্যি এটার সঙ্গে ডিমেট্রিয়াসের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সামারভিলের ধারণা ওটা বেদুইন বা ওই জাতীয় কোনও স্থানীয় আদিবাসীর ঢাক বা ড্রামের শব্দ— মরুভূমির খামখেয়ালি আবহাওয়ায় ম্যাগ্‌নিফাইড হয়ে একটা অস্বাভাবিক গুরুগম্ভীর চেহারা নিয়েছিল। হবেও বা। ওটা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই, কারণ ও-শব্দ আর শোনা যাবে বলে মনে হয় না।

১৮ই জানুয়ারি, সকাল সাড়ে দশটা

আমাদের দুজনকে বাধ্য হয়ে দলচ্যুত হতে হয়েছে। অর্থাৎ ক্যারাভ্যান চলে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঙ্গারিয়া ওয়েসিসের বাঁধা রাস্তায়, আর আমরা চলে এসেছি পথ ছেড়ে উত্তর দিকে। কেন এমন হল, সেটা বলি।

আজ ভোর ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত একটানা চলার পর হঠাৎ লক্ষ করলাম রাস্তার ডান দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা বালির ঢিপির উপর একপাল শকুনি। দেখেই কেন যেন বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল। পিছন ফিরে সামারভিলের দিকে চেয়ে দেখি, তারও দৃষ্টি ওই শকুনিরই দিকে। ক্যারাভ্যান চলেছে সেটার পাশ কাটিয়ে, অথচ একটা অদম্য কৌতূহল হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, শকুনিগুলো কীসের মাংস খেতে এত ব্যস্ত। আমার সঙ্গে যে উটওয়ালাটা ছিল, তাকে মতলবটা জানালাম। বললাম, দল ছেড়ে শকুনিগুলোর দিকে যাব, তারপর আবার ফিরে এসে দলে যোগ দেব ; তাতে তোমার আপত্তি আছে কি ?

লোকটা এককথায় রাজি হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার গতকালের অভিনয়ে কাজ দিয়েছে, এরা আমাকে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ বলে ঠাউরে নিয়েছে। সামারভিল ও আমি উট ও উটওয়ালা সমেত দল ছেড়ে ডানদিকে ঘুরলাম।

মিনিটপাঁচেক পরে ঢিবির কাছে পৌঁছে আমাদের কৌতূহল মিটল। শকুনিরা যেটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা হল উটের মস্ত দেহ।

কিন্তু শুধু কি তাই ? তার পাশেই যে আর একটা লাশ পড়ে আছে, সেটা তো জানোয়ারের নয়, সেটা মানুষের। আমাদের সঙ্গে যে লোকদুটো রয়েছে, এও তাদেরই মতো একজন উটওয়ালা। বোঝাই যাচ্ছে যে, উট সমেত এই উটওয়ালা আর একটি ক্যারাভ্যান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আপনা থেকেই মরেছে কি ? নাকি কেউ তাদের হত্যা করেছে ?

শকুনির দল থেকে দশ হাত দূরে বালির উপর ওটা কী পড়ে আছে ?

www.BDeBooks.Com

উট থেকে নেমে হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই প্রশ্নের উত্তর পেলাম। দুপুরের রোদে যেটা চকচক করছিল, সেটা একটা বন্দুকের নল ; বাঁটের দিকটা বালির নীচে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি, সেটা একটা জার্মান মাউজার রাইফ্‌ল। এই রাইফ্‌লের গুলিতেই যে এ দুটি প্রাণীর জীবনাবসান হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, এবং মন বলছে যে আততায়ী হলেন স্বয়ং প্রোফেসর হেক্‌টর ডিমেট্রিয়াস, যিনি এই একই মাউজার বন্দুক দিয়ে ক্রিট দ্বীপের সাইলোরিটি পাহাড়ের গায়ে ঝাউবনের ভিতর সেই নাম-না-জানা ব্যাঘ্রজাতীয় লোমশ প্রাণীটিকে হত্যা করেছিলেন।

আরও বোঝা যাচ্ছে যে এই মৃত উটওয়ালার এই মৃত উটের পিঠে চড়েই ডিমেট্রিয়াস তাঁর অভিযানে বেরিয়েছিলেন। এইপর্যন্ত এসে তাঁর বাহকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়— তাই তাকে মেরে ফেলেন। এরপর ডিমেট্রিয়াস যেখানেই গিয়ে থাকুন, তাঁকে পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে।

আমাদের উটওয়ালা দুটির দিকে চেয়ে মায়া হল। তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার কারণ যে শুধু এই হত্যার দৃশ্য, তা নয় ; কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে একেকটা দমকা পশ্চিমা বাতাসের সঙ্গে আবার শুনতে পাচ্ছি সেই দামামার শব্দ—দুম—ধুপ...দুম—ধুপ...দুম...—ধুপ...।

বুঝতে পারলাম যে, ওই আওয়াজ লক্ষ্য করেই আমাদের এগোতে হবে, এবং সম্ভব হলে উটের পিঠেই যেতে হবে। মন এখন বলছে ওই শব্দের সঙ্গে ডিমেট্রিয়াসের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

সামারভিলকে বলতে সে বলল, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু এবার আর তুমি ভেলকি দেখাতে চেষ্টা কোরো না ; যেভাবে ঘন ঘন বাতাস বইছে, তাতে ওই শব্দ সহজে

থামবে বলে মনে হয় না। উটওয়ালারা এমনি বললে বোধ হয় যেতে রাজি হবে না। দেখো, যদি টাকার লোভ দেখালে কিছু হয়।'

টাকায় কাজ হল, তবে অল্পে নয়, এবং বেশ কিছুটা আগাম দিতে হল। গত তিন ঘণ্টা ওই শব্দ লক্ষ্য করে আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়েছি। একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে উট থামিয়ে নামতে হয়েছে। চারিদিকে ধু ধু করছে মরুভূমি, আর তার মাঝখানে স্বর্গের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিরামিড সদৃশ বালির ঢিপি। হাইটে গিজার পিরামিডের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

আমরা ঢিপিটার থেকে বেশ কিছুটা দূরেই ক্যাম্প ফেলেছি। আরও কাছে গেলে হয়তো ওটার আয়তনের আরও সঠিক আন্দাজ পাব। মরুভূমিতে আন্দাজ করা ভারী কঠিন। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ওই বালির নীচে যদি প্রাচীন ঈজিপ্সীয় সভ্যতার কোনও অতিকায় নিদর্শন লুকিয়ে থাকে, তা হলে আমরাই হব তার প্রথম আবিষ্কর্তা। বালি না-সরা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। উটওয়ালা দুটোকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি। তাদের মুখে কথাই সরছে না। বোধ হয় অবিরাম দামামাধ্বনিতে তাদের বাক্যরোধ হয়েছে। এখান থেকে সব সময়ই সেই গুরুগম্ভীর শব্দটা শোনা যাচ্ছে, বাতাসের উপর আর নির্ভর করছে না সেটা! বলা যায় সে শব্দটা যেন এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা অঙ্গ। এক ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসেছি, তার মধ্যে একবারও শব্দটা থামেনি বা তার ছন্দপতন ঘটেনি। শুনলে মনে হয় যেন শব্দটা চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকবে।

বালির পাহাড়টা সম্পর্কে সামারভিলেরও ধারণা যে, ওটা আসলে একটা প্রাচীন স্তম্ভ বা মন্দির জাতীয় কিছু। আমরা ঠিক করেছি যে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর পাহাড়টার কাছে গিয়ে ওটার চারিদিকে ঘুরে ভাল করে অনুসন্ধান করব। শব্দটা সম্বন্ধে কিন্তু ওরও আমারই মতো হতভম্ব অবস্থা। তবে একটা কথা ও ঠিকই বলেছিল— শব্দটা মাটির নীচ থেকেই আসছে। আমরা বালিতে কান পেতে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। এইভাবে ক্রমাগত রাবুণে দুরমুশের শব্দে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হতে পারে। দেখা যাক, কী হয়, কপালে কী আছে!

পশ্চিমে আবার মেঘ করেছে। অল্প অল্প বাতাসও বইছে, আর তার সঙ্গে বালি।

১৮ই জানুয়ারি, বিকেল চারটে

প্রচণ্ড বালির ঝড়ে আমাদের তাঁবু প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে আবার ভূমিকম্প।

কিন্তু এই কাঁপুনির মধ্যেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম। দোলাটা সাধারণ ভূমিকম্পের মতো এ পাশ থেকে ও পাশ নয়। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হল, পায়ের তলা থেকে ভূখণ্ডের খানিকটা অংশ যেন আচমকা স্থান পরিবর্তন করল, আর তার ফলে আমরা সব কিছু সমেত বেশ খানিকটা নীচের দিকে চলে গেলাম। একজন লোক চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় তার তলা থেকে যদি সেটা হঠাৎ টেনে নেওয়া যায়, তা হলে যা হয়, এটাও ঠিক তাই। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় মাঝে মাঝে একটা ঘড় ঘড় করে শব্দ হয় সেটা আমি জানি; আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। কিন্তু আজকের কাঁপুনির সময় যে শব্দটা হল তেমন শব্দ আর কখনও হয়েছে কি না জানি না। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন জ্যান্ত হয়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। আমি যে আমি, আমারও কপালে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। মুরাদ ও সুলেমান— আমাদের দুই উটওয়ালা— দুজনেই আতঙ্কে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। ওষুধ দেওয়ার ফলে

www.BDeBooks.Com

দু'জনেরই অবশ্য জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু এরা আর কোনও দিন কথা বলতে পারবে বলে মনে হয় না। উটদুটোও দেখছি একেবারে থুম মেরে গেছে। তারা আর জাবর কাটছে না, কেবল একদৃষ্টে ওই রহস্যময় পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছে। ভূমিকম্পের চোটে পাহাড়টাও মনে হচ্ছে এক পাশে সামান্য কাত হয়ে গেছে। অবিশ্যি সেটা আমার দেখার ভুল হতে পারে। হিসেবপত্র সব কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র যে জিনিসটা অপরিবর্তিত রয়েছে, সেটা হল ওই দুম দুম দামামাধ্বনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যদি মনে হয় আর দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই তা হলে আমরা দুজনে একবার বেরোব। পাহাড়টার আর একটু কাছে না গেলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিকেল সোয়া পাঁচটা

সেই অদ্ভুত মরু-পর্বতের পাদদেশে বসে আবার ডায়রি লিখছি।

তাঁবু থেকে এটাকে যত উঁচু মনে করেছিলাম, কাছে এসে তার চেয়েও অনেক বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। এখানে দামামার শব্দে কান পাতা যায় না। সামারভিল ও আমি পরস্পরের সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে কথা বলার কাজ সারছি। তবে আশ্চর্য এই যে এহেন কর্ণপটহবিদারক শব্দও দেখছি ক্রমে অভ্যাস হয়ে আসছে। এখন আর আগের মতো অসহ্য মনে হচ্ছে না, বা চিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে না।

প্রথমে পাহাড়টা কী রকম দেখতে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি। এর পূর্ব পাশটা খাড়া উঠে গেছে উপর দিকে একেবারে চুড়ো পর্যন্ত। দূর থেকে দেখলে এটাকে একটা সমবাহু ত্রিভুজের মতো মনে হবে। চুড়ো থেকে পশ্চিম দিকে বালি নেমে এসেছে ঢালু হয়ে একেবারে জমি পর্যন্ত, যার ফলে উত্তর আর দক্ষিণে দুটো ত্রিভুজ দেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে। একটু পাশ থেকে ছবি আঁকলে এইরকম দাঁড়াবে—

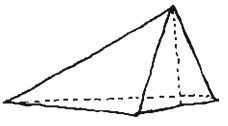

অর্থাৎ, এটাকে ঠিক পিরামিড বলা চলে না ; এর চেহারায় একটা বিশেষত্ব আছে।

তাঁবু থেকে পাহাড়ে আসার পথে দুটো আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার হয়েছে। সামারভিল কিছু দূরে বসে তারই একটার নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করছে। বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথম যেটা চোখে পড়ল, সেটা খয়েরি রঙের দড়ির মতন একটা জিনিস। বালি থেকে যেভাবে জিনিসটা বেরিয়েছিল, তাতে প্রথমে মনে হয়েছিল সেটা বুঝি শুকিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ জাতীয় একটা কিছু। কিন্তু কাছে এসে হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম, তা নয়। দড়ি বললেও অবিশ্যি ঠিক বলা হয় না, কারণ তার একেকটার বেড় একটা মোটা বাঁশের সমান। দুজনে অনেক টানাটানি করেও জিনিসটাকে স্থানচ্যুত করা গেল না। শেষকালে সামারভিল ছুরি দিয়ে খানিকটা অংশ কেটে সঙ্গে নিয়ে নিল পরীক্ষা করার জন্য।

যে জিনিসটা আমাদের আরও বেশি অবাক করল, সেটা সম্ভবত কোনও ধাতুর তৈরি। জিনিসটার রং হালকা লাল ; দেখে মনে হয়, একটা বিরাট চাকার একটা পাশের খানিকটা

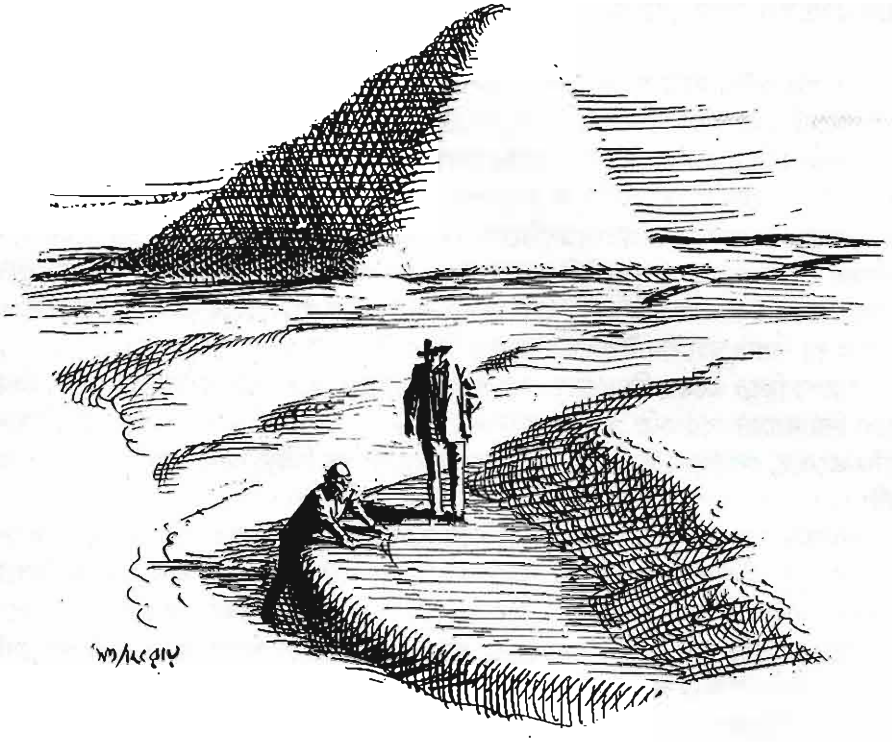

অংশ। এই সামান্য অংশ থেকেও চাকার আয়তনের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। হিসেবে বলছে, তার পরিধি অন্তত দুশো ফুট। অর্থাৎ তার মধ্যে দিব্যি একটা আস্ত টেনিস কোর্ট ঢুকে যায়। এটাকেও অবিশ্যি হাত দিয়ে টানাটানি করে কোনও ফল হল না। এই মরুভূমির পরিবেশে এই অতিকায় ধাতবচক্র এতই অস্বাভাবিক, এবং প্রাচীন মিশরের সঙ্গে এর সম্পর্ক এতই ক্ষীণ যে এটা আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। তা হলে কি ডিমেট্রিয়াস সাহারার গর্ভে একটি গবেষণাগার বা কারখানা জাতীয় কিছু স্থাপন করেছে— যার সঙ্গে এই দড়ি ও এই চাকা যুক্ত ? এবং যার যন্ত্রপাতি-কলকবজার শব্দ বাইরে থেকে দামামার শব্দের মতো শোনাচ্ছে ? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে এই ভূগর্ভস্থিত কারখানায় ঢোকার দরজা কোথায় ? ডিমেট্রিয়াসই বা সেখানে গেল কী করে ? আর এমন কী ভয়ঙ্কর গোপন গবেষণায় সে লিপ্ত থাকতে পারে, যার জন্য সাহারার মতো জনমানবশূন্য প্রান্তরের প্রয়োজন হয় ?

পাহাড়ের পূর্ব পাশ, অর্থাৎ যে পাশটা খাড়াই উঠে গেছে, সে পাশ থেকে মাঝে মাঝে বালি খসে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখে সন্দেহ হয় যে ভিতরটা ফাঁপা— এবং তার মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচলের একটা রাস্তা রয়েছে। একবার ও দিকটায় গিয়ে হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে দেখলে কেমন হয় ?

সামারভিল তার জায়গা ছেড়ে উঠেছে। ও পুব দিকটাতেই যাচ্ছে। ওর সঙ্গে যাওয়া দরকার। একজনের যদি কিছু হয়, তা হলে অন্যজনকে ভারী অসহায় হয়ে পড়তে হবে।

www.BDeBooks.Com

রাত এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট

গত পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।

প্রথমেই বলি, আমি আর সামারভিল পাহাড়ের পুব দিকটায় গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে হাত দিয়ে বালি সরিয়ে একটা গহ্বর বা সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছি। তার ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তীব্র টর্চের আলো ফেলে দূরবীণ দিয়ে দেখেও কূলকিনারা করা যায়নি। গহ্বরের মধ্য থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ড দমকা বাতাস বেরিয়ে এসে আমাদের কাজে রীতিমতো ব্যাঘাতের সৃষ্টি করছিল। তবু আমরা হাল ছাড়িনি। শেষটায় সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ফিরে আসতে হয়েছে। কাল যদি দেখি, বালি কিছুটা কমেছে, তা হলে গহ্বরে ঢোকার চেষ্টা করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহস্যের উত্তর এই গহ্বরের ভিতরেই রয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে কফির ব্যবস্থা করলাম। আমার বড়িতে খিদে তেষ্টা দুইই মেটে, কিন্তু সারা দিন কাজের পর কফি খাওয়ার আনন্দটা মেটে না। সামারভিল সঙ্গে কিছু ব্রেজিলিয়ান কফি এনেছে, সেটাই খাওয়া হচ্ছে। কফি সেবনের পর যে বিচিত্র ঘটনাটা ঘটল, সেটার কথা বলি।

সামারভিল ডিমেট্রিয়াসের সবুজ খাতা খুলে বসেছিল। তার অদ্ভুত অক্ষরে অদ্ভুত লেখার কোনও সূত্র এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আজও আধ ঘণ্টা ধরে খাতার পাতা উলটে কোনও সুবিধা করতে না পেরে চোখ থেকে চশমা খুলে খোলা খাতার উপর রেখে সামারভিল মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। আমিও চিন্তিতভাবে পাশে বসে সে দিনের সেই অদ্ভুত প্যানথার জাতীয় জানোয়ার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একটার পর একটা যত বিদঘুটে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আমার চোখ পড়ল ডিমেট্রিয়াসের খোলা খাতার উপর। সামারভিলের চশমাটা তার উপর কাত করে রাখা রয়েছে। লক্ষ করলাম চশমার কাচে ডিমেট্রিয়াসের হাতের লেখা আয়নার মতো প্রতিফলিত হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকেই বুঝলাম, সে লেখা আমি চিনতে পারছি, সে ভাষা আমার চেনা ভাষা। আর সে ভাষা গ্রিকও নয়, অন্য কিছুই নয়— একেবারে সহজ সরল ইংরিজি। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

ব্যাপারটা আর কিছুই না—অন্য লোকে যাতে সহজে পড়তে না পারে, তাই ডিমেট্রিয়াস ইংরিজি লিখেছে উলটো করে— অর্থাৎ, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। একে বলে mirror writing। এর ফলে চেনা ভাষা হয়ে যায় দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষা। অথচ আয়নার সামনে ধরলে সে ভাষা পড়তে আর কোনই অসুবিধা হয় না। মনে পড়ল ইতালির বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর নোটবুকে এই mirror writing ব্যবহার করতেন।

গত এক ঘণ্টা ধরে সামারভিলের দাড়ি কামাবার আয়না সামনে রেখে আমরা ডিমেট্রিয়াসের লেখার বেশির ভাগটাই পড়ে ফেলেছি। লেখা থেকে যা জানা গেল মোটামুটি এই—

ক্রীট দ্বীপের ক্নোসাস্ শহরে পাঁচ হাজার বছরের একটা পুরনো মন্দিরের ভগ্নস্তূপ থেকে ডিমেট্রিয়াস একটা পাথরে খোদাই করা লেখা পায়। সেটার মানে উদ্ধার করে সে জানতে পারে যে, লেখাটা একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ওষুধের ফরমুলা। সে ওষুধ খেলে নাকি মানুষের শরীরে দেবতার শক্তি সঞ্চারিত হয়। ডিমেট্রিয়াস সেই ওষুধ তৈরি করার সংকল্প করেছিল, এবং লেখা পড়ে মনে হয় সফলও হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১লা জানুয়ারি সে নাকি ফিলিক্স্ নামে একজন কাউকে সে ওষুধ খাইয়ে পরীক্ষাও করেছিল। এই ফিলিক্স্ ব্যক্তিটি যে কে, সেটা কোথাও বলা নেই ; তবে সামারভিল ও আমি দুজনেই জানি 'ফিলিক্স'

মানুষের নাম হলেও, কথাটার আসল মানে হচ্ছে বেড়াল, অথবা বেড়াল শ্রেণীর কোনও প্রাণী। যেমন বাঘের ল্যাটিন নাম হল ফিলিস টাইগ্রিস। তা হলে কি...না ; আর লেখা সম্ভব নয়। বাইরে ঝড় আর তার সঙ্গে বৃষ্টি।...

২২শে জানুয়ারি...

ঘণ্টা দুয়েক হল কায়রোতে পৌঁছেছি। হাত কাঁপছে, তবুও টাটকা থাকতে থাকতে গত দু' দিনের বিভীষিকাময় ঘটনার কথা লিখে রাখতে চাই। একটা পুরো দিন নষ্ট হয়েছে ক্যারাভ্যানের অপেক্ষায় বসে থেকে। আমাদের উট এবং দুজন উটওয়ালাই নিখোঁজ, সম্ভবত মৃত। কাজেই আমাদের দুজনকে ক্ষতবিক্ষত অবসন্ন শরীরে বালির উপর দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে তবে ক্যারাভ্যানের রাস্তায় আসতে হয়েছিল। আমার ওষুধের গুণে ঘা শুকিয়ে এসেছে, এমনকী সামারভিলের কনুইয়ের ভাঙা হাড়ও জোড়া লেগে গেছে ; কিন্তু মনের অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়, হতেও পারে না। কী ভাগ্যি ওষুধের শিশি, ডায়রি, কলম, মানিব্যাগ, ডুপ্লিকেট চশমা আর অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা আমার পকেটে ছিল। বাকি সব কিছুই—এমন কী ডিমেট্রিয়াসের খাতা পর্যন্ত— কোথায় যে তলিয়ে গেছে, তার কোনও পাত্তাই নেই।

১৮ই জানুয়ারি রাত এগারোটার পর তাঁবুতে বসে ডায়রি লিখতে লিখতে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির সূত্রপাত হল সে কথা আগেই লিখেছি। এখানে বছরে মাত্র তিন-চার দিন বৃষ্টি হয় বলেই কি না জানি না, এমন চোখধাঁধানো মুষলধারা ও তার সঙ্গে ঝড়ের এমন দাপট আমি কখনও দেখিনি। তাঁবুর এক পাশের ক্যানভাস হাওয়ায় ফেঁপে উঠে ঝাপটা মেরে প্রথমেই আমার আলোটাকে দিল অকেজো করে। এদিকে বাইরে দুর্যোগের ফলে উট দুটো বিকট চিৎকার আরম্ভ করেছে ; আর মুরাদ ও সুলেমান বালি কামড়ে পড়ে তারস্বরে আল্লার নাম জপছে।

পৌনে বারোটা নাগাদ (আমার ঘড়ির কাঁটায় রেডিয়াম থাকায় কেবল সময়টাই দেখতে পাচ্ছিলাম) ঝড়ের শব্দ কমে এল। আমাদের তাঁবু আর দাঁড়িয়ে নেই। সেটা এখন আমাদের দুজনের গায়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো, এবং আমরা প্রাণপণে সেটাকে আঁকড়ে ধরে আছি যাতে বৃষ্টি থামলে যেন আবার সেটাকে ছাউনি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

ঠিক বারোটার সময়ে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুতের চমক হল, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হল প্রলয়ংকর ভূমিকম্প। প্রথম ধাক্কাতেই দেখলাম আমি আর মাটিতে নেই ; এক ঝটকায় কীসে যেন আমাকে ব্যাট দিয়ে মারা ক্রিকেট বলের মতো শূন্যে তুলে ফেলেছে। এই শূন্যপথে অন্তত পাঁচ সেকেন্ড ধরে প্রচণ্ড বেগে উড়ে গিয়ে আমি সজোরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বরফের মতো ঠাণ্ডা ভিজে বালির ওপর। আমার মাথার উপর আর তাঁবুর আচ্ছাদন নেই, আমার পাশে সামারভিলও নেই। দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাতে সাহারার একটা অংশে আমি একা বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে বৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হচ্ছি। সামারভিল কোথায়, সে বেঁচে আছে কি না,— উট এবং উটওয়ালাগুলোই বা কোথায়, তারাই বা বেঁচে আছে কি না, কিচ্ছু জানার উপায় নেই।

হঠাৎ আর একটা ঝটকায় আমি আরও কিছু দূর গড়িয়ে গেলাম। তারপর ভূমি স্থির হল। ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। তারপর সব চুপ, সব শব্দ বন্ধ।

কোনও শব্দই নেই ? সেই দামামাধ্বনি ?

না, তাও নেই। আশ্চর্য ! সেই কর্ণভেদী দুম দুম শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে।

তার বদলে একটা অস্বাভাবিক শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা আমার বুকের উপর চেপে

www.BDeBooks.Com

বসেছে। কিন্তু ওই ভূগর্ভোত্থিত গুরুগম্ভীর শব্দ হঠাৎ বন্ধ হবার কারণ কী ?

মাথাটা একটু উঁচু করে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখলাম। অন্ধকার চলে গেছে। কিন্তু এত আলো হয় কী করে ? সব কিছুই এত স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে কী করে ?

হঠাৎ খেয়াল হল— আকাশ পরিষ্কার। একটা মাত্র হালকা টুকরো মেঘ চাঁদের উপর থেকে সরে যাচ্ছে। পূর্ণিমার চাঁদ।

মেঘ সরে গেল। এখন পূর্ণ জ্যোৎস্না। এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল চাঁদের আলো কখনও দেখিনি।

ওটা কে— ওই বাঁ দিকে, বিশ হাত দূরে ? সামারভিল না ?

হ্যাঁ, সামারভিল। সামারভিল দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাঁক দিলাম— 'আর্থার ! আর্থার !'

কোনও উত্তর নেই। সে কি কালা হয়ে গেছে ? না পাগল ? কীসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে ?

আমার দৃষ্টি সেই দিকে গেল। পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়ের উপর থেকে বালি সরে গেছে। কিন্তু তার তলা থেকে যেটা বেরিয়েছে, সেটা কী ? আর পাহাড়ের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দু' দিকে ঘন জঙ্গলটা কীসের ?

আমি সামারভিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। দৃষ্টি পাহাড়ের দিক থেকে সরাতে পারছি না। অবাক বিস্ময়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কারণ আমি ক্রমে বুঝতে পারছি যে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে যে বিশাল জিনিসটা, সেটা আসলে আমার চেনা। আর পুব দিকের খাড়াই অংশের গায়ে যে দুটো বিরাট গহ্বর, যাকে আমরা কারখানায় যাবার সুড়ঙ্গ বলে মনে করেছিলাম— সেটাও আমার চেনা। গহ্বর দুটো আসলে নাকের ফুটো, আর পাহাড়টা একটা শুয়ে থাকা মানুষের নাক, আর নাকের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দু পাশে জঙ্গলটা হচ্ছে ভুরু, আর তার নীচের প্রশস্ত ঢিপিটা হচ্ছে বন্ধ হওয়া চোখ !

'ডিমেট্রিয়াস !'

সামারভিলের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর সাহারার এই অপার্থিব জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দিগন্তবিস্তৃত

নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—

'ডিমেট্রিয়াস !...ডিমেট্রিয়াস !...'

হ্যাঁ, ডিমেট্রিয়াস। ওই নাক আমি ছবিতে দেখেছি। ওই ভুরুও দেখেছি। ওই চোখ দেখেছি খোলা অবস্থায়। এখন বন্ধ, কারণ ডিমেট্রিয়াসের মৃত্যু হয়েছে। তার মুখেরই খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে বালির উপর, আর তার বুকের একটা অংশ। খয়েরি রঙের দড়িটা আসলে ওর গায়ের একটা লোম। আর সেই যে জিনিসটা, যেটাকে একটা বৃত্তের অংশ বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে হাতের একটা নখ।

'ভূমিকম্পের কারণ বুঝতে পারছ ?' সামারভিল জিজ্ঞেস করল।

বললাম, 'পারছি। ডিমেট্রিয়াস মৃত্যুশয্যায় বালির নীচে ছটফট করছিল।'

'আর দামামাধ্বনি ?'

'ডিমেট্রিয়াসের হার্টবিট।—ডিমেট্রিয়াস তার ওষুধ প্রথমে তার বেড়াল ফিলিক্সের উপর পরীক্ষা করে। তার ফলেই অতিকায় বেড়ালের সৃষ্টি হতে চলেছিল, ডিমেট্রিয়াস বেগতিক বুঝে তার বাড়া বন্ধ করার জন্য বন্দুকের সাহায্য নিয়েছিল।'

'কিন্তু তার নিজের বাড়াটা মাঝপথে বন্ধ হয় সেটা সে চায়নি। সে খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতোই জানতে চেয়েছিল, তার ওষুধের দৌড় কতদূর।'

'ঠিক বলেছ। তার নিজের বিশ্বাস ছিল সে অতিকায় মানুষে পরিণত হবে, তাই তার পরীক্ষার জন্য দিগন্তহীন মরুভূমির প্রয়োজন হয়েছিল।'

'কতটা লম্বা হবে ডিমেট্রিয়াসের দেহটা, সেটা আন্দাজ করে দেখেছ ?'

আমি বললাম, 'নাকের পূর্ব দিকের অংশটা যদি আন্দাজ একশো ফুট উঁচু হয় তা হলে পুরো শরীরটা অন্তত তার ষাটগুণ হওয়া উচিত।'

'অর্থাৎ ছ'হাজার ফুট।'

'অর্থাৎ এক মাইলেরও বেশি।'

সামারভিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তা হলে বেদেবুড়ির কথা সত্যি হল !'

আমি বললাম, 'অক্ষরে অক্ষরে। আজ উনিশে জানুয়ারি। দামামাধ্বনি বন্ধ হল ঠিক রাত বারোটায় !'

* * *

দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হল।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেলাম। আকাশ কালো করে নীচে নেমে আসছে পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার শকুনি। দেখে মনে হয়, পৃথিবীতে যত শকুনি আছে সব একজোটে ওই ছ' হাজার ফুট লম্বা মানব-দানবের শবদেহ ভক্ষণ করতে আসছে।

দৃশ্যটা দেখে ভাল লাগল না। অন্তত আমাদের চোখের সামনে এ ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না।

আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে আকাশের দিকে তাক করে তিন সেকেন্ড ঘোড়াটা টিপে রাখতেই দেখতে দেখতে শকুনির দল নিশ্চিহ্ন হয়ে বৃষ্টিধোয়া সাহারার আকাশের নীল নির্মল রূপটা আবার ফিরে এল।

www.BDeBooks.Com

কর্ভাস

১৫ই আগস্ট

পাখি সম্পর্কে কৌতূহলটা আমার অনেক দিনের। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা পোষা ময়না ছিল, সেটাকে আমি একশোর উপর বাংলা শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, পাখি কথা বললেও কথার মানে বোঝে না। একবার এই ময়নাটাই এমন এক কাণ্ড করে বসল যে, আমার সে ধারণা প্রায় পালটে গেল। দুপুরবেলা সবেমাত্র আমি ইস্কুল থেকে ফিরছি, মা রেকাবিতে মোহনভোগ এনে দিয়েছেন, এমন সময় ময়নাটা হঠাৎ 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা কোনও কম্পন টের পাইনি, কিন্তু পরের দিন কাগজে বেরোল সিজ্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে সত্যিই নাকি একটা মৃদু কম্পন ধরা পড়েছে।

সেই থেকে পাখিদের বুদ্ধির দৌড় সম্পর্কে মনে একটা অনুসন্ধিৎসা রয়ে গেছে, কিন্তু অন্যান্য পাঁচ রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে ওটা নিয়ে আর চর্চা করা হয়নি। আর একটা কারণ অবিশ্যি আমার বেড়াল নিউটন। নিউটন পাখি পছন্দ করে না, আর নিউটনকে অখুশি করে আমার কিছু করতে মন চায় না। সম্প্রতি, বয়সের জন্যই বোধ হয়, নিউটন দেখছি পাখি সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই আমার ল্যাবরেটরিতে আবার কাক, চড়ুই, শালিক ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আমি সকালে তাদের খেতে দিই। সেই খাদ্যের প্রত্যাশায় তারা সূর্য ওঠার আগে থেকেই আমার জানালার বাইরে জটলা করে।

প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সহজাত ক্ষমতা থাকে। আমার ধারণা, অন্য প্রাণীর তুলনায় পাখির ক্ষমতা আরও বেশি, আরও বিস্ময়কর। একটা বাবুইয়ের বাসা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। একজন মানুষকে কিছু খড়কুটো দিয়ে যদি ও রকম একটা বাসা তৈরি করতে বলা হয়, আমার বিশ্বাস সে কাজটা সে আদৌ করতে পারবে না, কিংবা যদি বা পারে তো মাসখানেকের অক্লান্ত পরিশ্রম লেগে যাবে।

অস্ট্রেলিয়াতে ম্যালি-ফাউল বলে এক রকম পাখি আছে, যারা মাটিতে বাসা করে। বালি, মাটি আর উদ্ভিজ্জ দিয়ে তৈরি একটা ঢিপি, আর তার ভিতরে ঢোকার জন্য একটা গর্ত। ডিম পাড়ে বাসার ভিতরে, কিন্তু সে ডিমে তা দেয় না। অথচ উত্তাপ না হলে তো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে না। উপায় কী ? উপায় হল এই যে ম্যালি-ফাউল কোনও এক আশ্চর্য অজ্ঞাত কৌশলে বাসার ভিতরের তাপমাত্রা আটাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের এক ডিগ্রিও এদিক ওদিক হতে দেয় না, তা বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা বা গরম যাই হোক না কেন।

আরও রহস্য। গ্রিব নামক পাখি তাদের নিজেদের পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় এবং শাবকদের খাওয়ায়, কেন তা কেউ জানে না। আবার এই একই গ্রিব পাখি জলে ভাসমান অবস্থায় কোনও শত্রুর আগমনের ইঙ্গিত পেলে, নিজের দেহ ও পালক থেকে কোনও এক অজ্ঞাত উপায়ে বায়ু বার করে দিয়ে শরীরের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়িয়ে গলা অবধি জলে ডুবে ভাসতে থাকে।

এ ছাড়া যাযাবর পাখির দিকনির্ণয় ক্ষমতা, ঈগল-বাজের শিকার ক্ষমতা, শকুনের ঘ্রাণশক্তি, অসংখ্য পাখির আশ্চর্য সংগীতপ্রতিভা— এ সব তো আছেই। এই কারণেই কিছু দিন থেকে পাখির পিছনে কিছুটা চিন্তা ও সময় দিতে ইচ্ছা করছে। তার সহজাত বুদ্ধির বাইরে তাকে কত দূর পর্যন্ত নতুন জিনিস শেখানো যায় ? মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে সঞ্চার করা যায় কি ? এমন যন্ত্র কি তৈরি করা সম্ভব, যার সাহায্যে এ কাজটা হতে পারে ?

২০শে সেপ্টেম্বর

আমার পাখিপড়ানো যন্ত্র নিয়ে কাজ চলেছে। আমি সহজ পথে বিশ্বাসী। আমার যন্ত্রও তাই হবে জলের মতো সহজ। দুটি অংশে হবে এই যন্ত্র। একটি হবে খাঁচার মতো। পাখি থাকবে সেই খাঁচার মধ্যে। খাঁচার সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগ থাকবে দ্বিতীয় অংশের। এই অংশটি থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধি চালিত হবে পাখির মস্তিষ্কে।

এই এক মাস আমার ল্যাবরেটরির জানালা দিয়ে খাদ্যের লোভে যে সব পাখি এসে ঢুকেছে, সেগুলোকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করেছি। কাক, চড়ুই, শালিক ছাড়া পায়রা, ঘুঘু, টিয়া, বুলবুলি ইত্যাদিও মাঝে মাঝে আসে। সব পাখির মধ্যে একটি বিশেষ পাখি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা একটা কাক। দাঁড়কাক নয়, সাধারণ কাক। কাকটা আমার চেনা হয়ে গেছে। ডান চোখের নীচে একটা সাদা ফুটকি আছে, সেটা থেকে তো চেনা যায়ই, তা ছাড়া হাবভাবও অন্য কাকের চেয়ে বেশ একটু অন্য রকম। ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে টেবিলের উপর আঁচড় কাটতে আর কোনও পাখিকে দেখিনি। কালকে তো একটা ব্যাপারে রীতিমতো হকচকিয়ে গেছি। আমি আমার যন্ত্র তৈরির কাজ করছি, এমন সময় একটা খচ খচ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, কাকটা একটা আধখোলা দেশলাইয়ের বাক্স থেকে ঠোঁট দিয়ে একটা কাঠি বার করে তার মাথাটা বাক্সের পাশটায় ঘষছে। আমি বাধ্য হয়ে হুস হুস শব্দ করে কাকটাকে নিরস্ত করলাম। কাকটা তখন উড়ে গিয়ে জানালায় বসে গলা দিয়ে দ্রুত কয়েকটা শব্দ করল, যেটার সঙ্গে কাকের স্বাভাবিক কা কা শব্দের কোনও সাদৃশ্য নেই। হঠাৎ শুনে মনে হবে, যেন কাকটা বুঝি হাসছে।

যে রকম চালাক পাখি, আমার পরীক্ষার জন্য একে ব্যবহার করতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হবে। দেখা যাক কত দূর কী হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আমার 'অরনিথন' যন্ত্র আজ তৈরি শেষ হল। কাকটা সকালেই আমার ঘরে ঢুকে পাঁউরুটি খেয়ে এ জানালা ও জানালা লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, যন্ত্রটা টেবিলের উপর রেখে যেই তার দরজা খুলে দিলাম, অমনি কাক দিব্যি লাফাতে লাফাতে এসে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। এ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, কাকটার শেখার আগ্রহ প্রবল। প্রথমে কিছুটা ভাষা জ্ঞান হওয়া দরকার, না হলে আমার কথা বুঝতে পারবে না ; তাই সহজ বাংলা দিয়ে শুরু করেছি। আমাকে বোতাম টেপা ছাড়া আর কোনও কাজই করতে হচ্ছে না। শেখাবার বিষয় সমস্তই আগে থেকে রেকর্ড করা। বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন বিষয়, প্রত্যেকটার আলাদা নম্বর দেওয়া। একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম— বোতাম টিপলেই কাকটার চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে যায়। কাকের মতো ছটফটে পাখির পক্ষে এটা যে কত অস্বাভাবিক, সে তো বুঝতেই পারছি।

www.BDeBooks.Com

নভেম্বর মাসে চিলির রাজধানী সানতিয়াগো শহরে সারা বিশ্বের পক্ষিবিজ্ঞানীদের একটা কনফারেনস্ আছে। মিনেসোটাতে আমার পক্ষিবিজ্ঞানী বন্ধু রিউফাস গ্রেনফেলকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। যদি আমার বায়স বন্ধুটি সত্যি করে মানুষের বুদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত করতে পারে, তা হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সম্মেলনে ডিমন্‌স্ট্রেশন সহ একটা বক্তৃতা দেওয়া চলতে পারে।

৪ঠা অক্টোবর

কর্ভাস হল কাক জাতীয় পাখির ল্যাটিন নাম। আমার ছাত্রটিকে আমি ওই নামেই ডাকছি। নাম ধরে ডাকলে প্রথম দিকে আমার দিকে ফিরে ফিরে চাইত, এখন দেখছি গলা দিয়ে শব্দ করে উত্তর দেয়। এই প্রথম একটা কাককে 'কা' না বলে 'কি' বলতে শুনছি। তবে কণ্ঠস্বরের বিশেষ পরিবর্তন আমি আশা করছি না। অর্থাৎ কর্ভাসকে দিয়ে কথা বলানো চলবে না। তার বুদ্ধির পরিচয় তার কাজেই প্রকাশ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্ভাস এখন ইংরাজি শিখছে। বাইরে গিয়ে ডিমন্‌স্ট্রেশন দিতে গেলে এই ভাষাটার প্রয়োজন হবে। ওর ট্রেনিং-এর সময় হল সকাল আটটা থেকে ন'টা। দিনের বেলা বাকি সময়টা ও আমার ঘরের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যা হলে এখনও রোজই চলে যায় আমার বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণের আম গাছটায়।

নিউটন দেখছি কর্ভাসকে দিব্যি মেনে নিয়েছে। আজকে যে ঘটনাটা ঘটল, তার পরে সম্পর্কটা বন্ধুত্বে পরিণত হলেও আশ্চর্য হব না। ব্যাপারটা ঘটল দুপুরে। নিউটন আমার আরাম কেদারাটার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কর্ভাস কোথায় যেন উধাও, আমি খাতায় নোট লিখছি, এমন সময় হঠাৎ ডানার ঝটপটানি শুনে জানালার দিকে চেয়ে দেখি কর্ভাস ঘরে ঢুকেছে, তার ঠোঁটে একটি সদ্য কাটা মাছের টুকরো। সে সেটাকে এনে থপ করে নিউটনের সামনে ফেলে দিয়ে আবার জানালায় ফিরে গিয়ে বসে বসেই ঘাড় বেঁকিয়ে এ দিক ও দিক দেখতে লাগল।

গ্রেনফেল আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে। লিখেছে, সে পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে আমাকে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে। আমি অবশ্যই যেন কাক সমেত যথাসময়ে সানতিয়াগোতে গিয়ে হাজির হই।

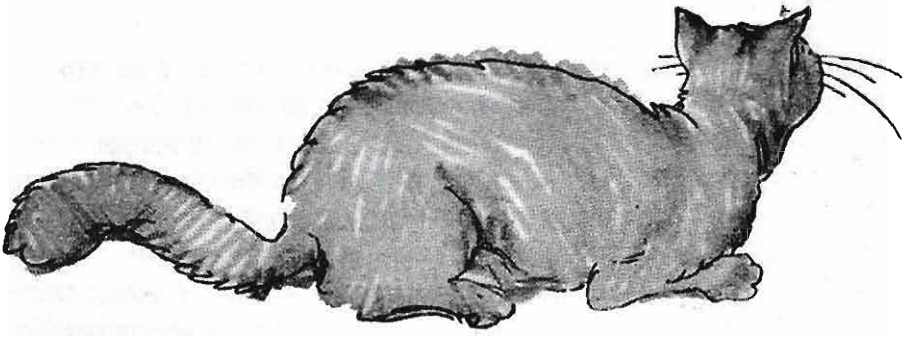

S.RAY

www.BDeBooks.Com

২০শে অক্টোবর

দু' সপ্তাহে অভাবনীয় প্রোগ্রেস। কর্ভাস ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে ইংরিজি কথা আর সংখ্যা লিখছে। কাগজটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিতে হয়, কর্ভাস তার উপর দাঁড়িয়ে লেখে। ওর নিজের নাম ইংরাজিতে লিখল— C-O-R-V-U-S। সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে, ইংল্যান্ডের রাজধানী কী জিজ্ঞেস করলে লিখতে পারছে, আমার পদবি লিখতে পারছে। তিন দিন আগে মাস, বার, তারিখ শিখিয়ে দিয়েছিলাম, আজকে কী বার, জিজ্ঞেস করাতে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল— F-R-I-D-A-Y।

কর্ভাসের খাওয়ার ব্যাপারেও বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। আজ একটা পাত্রে রুটি-টোস্টের টুকরো আর আরেকটাতে খানিকটা পেয়ারার জেলি ওর সামনে রেখেছিলাম। ও রুটির টুকরোগুলো মুখে পোরার আগে প্রতি বারই ঠোঁট দিয়ে খানিকটা জেলি মাখিয়ে নিচ্ছিল।

২২শে অক্টোবর

কর্ভাস যে এখন সাধারণ কাকের থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চায়, তার স্পষ্ট প্রমাণ আজকে পেলাম। আজ দুপুরে হঠাৎ খুব বৃষ্টি হল, সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত। তিনটে নাগাত একটা কানফাটানো বাজ পড়ার শব্দ শুনে জানালার কাছে গিয়ে দেখি, আমার বাগানের বাইরের শিমুল গাছটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বিকেলে বৃষ্টি থামার পর প্রচণ্ড কাকের কোলাহল। এ তল্লাটে যত কাক আছে, সব ওই মরা গাছটায় জড়ো হয়ে হল্লা করছে। আমার চাকর প্রহ্লাদকে ব্যাপারটা দেখতে পাঠালাম। সে ফিরে এসে বলল, 'বাবু, একটা কাক মরে পড়ে আছে গাছটার নীচে, তাই এত চেল্লাচেল্লি।' বুঝলাম বাজ পড়ার ফলেই কাকটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য— কর্ভাস আমার ঘর থেকে বেরোবার কোনও রকম আগ্রহ দেখাল না। সে একমনে পেনসিল মুখে দিয়ে প্রাইম নাম্বার্স লিখে চলেছে— 2,3,4,5,7,11,13.....

৭ই নভেম্বর

কর্ভাসকে এখন সদর্পে বৈজ্ঞানিক মহলে উপস্থিত করা চলে। পাখিকে শিখিয়ে পড়িয়ে খুঁটিনাটি ফরমাশ খাটানোর নানা রকম উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ভাসের মতো এমন শিক্ষিত পাখির নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে বলে আমার জানা নেই। অরনিথন যন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। অঙ্ক, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি সব বিষয়েই যে সব প্রশ্নের উত্তর সংখ্যার সাহায্যে বা অল্প কয়েকটি শব্দের সাহায্যে দেওয়া যায়, কর্ভাস তা শিখে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে যে জিনিসটা প্রায় আপনার থেকে জেগে উঠেছে, সেটাকে বলা চলে মানবসুলভ বুদ্ধি বা হিউম্যান ইনটেলিজেন্স— যেটার সঙ্গে পাখির কোনও সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সানতিয়াগো যাব বলে আজ সকালে আমার সুটকেস গোছাচ্ছিলুম। গোছানো শেষ হলে পর বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে পাশে ফিরে দেখি, কর্ভাস সুটকেসের চাবিটা ঠোঁটে নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল গ্রেনফেলের আর একটা চিঠি পেয়েছি। ও সানতিয়াগো পৌঁছে গেছে।

পক্ষিবিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমার আসার পথ চেয়ে আছে। এর আগে এই সব সম্মেলনে কেবল পাখি নিয়ে বক্তৃতাই হয়েছে, জ্যান্ত পাখির সাহায্যে উদাহরণ সমেত কোনও বক্তৃতা কখনও হয়নি। গত দু' মাসের গবেষণার ফলে পাখির মস্তিষ্কের বিষয়ে আমি যে দুর্লভ জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, সে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখছি। সেটাই হবে সম্মেলনে আমার পেপার। প্রতিবাদীর মুখ বন্ধ করার জন্য সঙ্গে থাকবে কর্ভাস।

১০ই নভেম্বর

দক্ষিণ আমেরিকা যাবার পথে প্লেনে বসে এই ডায়রি লিখছি। একটিমাত্র ঘটনাই লেখার আছে। বাড়ি থেকে যখন রওনা হব, তখন কভার্স হঠাৎ দেখি তার খাঁচা থেকে বার হওয়ার জন্য ভারী ছটফটানি আরম্ভ করেছে। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে খাঁচার দরজা খুলে দিতেই সে সটান উড়ে গিয়ে আমার রাইটিং টেবিলে বসে ঠোঁট দিয়ে উপরের দেরাজটায় ভীষণ ব্যস্তভাবে টোকা মারতে আরম্ভ করল। দেরাজ খুলে দেখি, আমার পাসপোর্ট-টা তার মধ্যে রয়ে গেছে।

কর্ভাসের জন্য একটা নতুন ধরনের খাঁচা বানিয়ে নিয়েছি। যে আবহাওয়া কর্ভাসের পক্ষে সবচেয়ে আরামদায়ক, খাঁচার ভিতর কৃত্রিম উপায়ে সেই আবহাওয়া বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছি। খাবার জন্য কাকের পক্ষে পুষ্টিকর ভিটামিন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক বড়ির মতো মুখরোচক বড়ি তৈরি করে নিয়েছি।

প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে কেউই বোধ হয় এর আগে কখনও পোষা কাক দেখেনি। কর্ভাস তাই সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করছে। তবে আমি আমার কাকের বিশেষত্ব সম্পর্কে কাউকে কিছু বলিনি। ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই অনুমান করেই বোধ হয় কর্ভাসও সাধারণ কাকের মতোই ব্যবহার করছে।

১৪ই নভেম্বর

হোটেল একসেলসিয়র, সানতিয়াগো। রাত এগারোটা। দু' দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম, তাই ডায়রি লেখার সময় পাইনি। আগে আমার বক্তৃতার কথাটা বলে নিই, তারপর এই কিছুক্ষণ আগের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আসা যাবে। এক কথায় বলা যায়, কর্ভাসসহ আমার বক্তৃতাটা হয়েছে— অ্যানাদার ফেদার ইন মাই ক্যাপ। লেখাটা পড়তে লেগেছিল আধ ঘণ্টা, তারপর কর্ভাসকে নিয়ে ডিমন্‌সট্রেশন চলল এক ঘণ্টার উপর। আমি মঞ্চে উঠেই কর্ভাসকে খাঁচা থেকে বার করে টেবিলের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রকাণ্ড লম্বা মেহগনির টেবিল, তার পিছনে লাইন করে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষরা বসেছেন, আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনে আমার প্রবন্ধ পড়ছি। পড়া যতক্ষণ চলল, ততক্ষণ কর্ভাস এক পা-ও নড়েনি। তার এক পাশে ঘাড় কাত করার ভঙ্গি ও মাঝে মাঝে মাথা উপরনীচ করা থেকে মনে হচ্ছিল, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে এবং কথা বুঝতেও পারছে। বক্তৃতা শেষ হবার পর চারিদিক থেকে করধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠঠোকরার মতো শব্দ শুনে টেবিলের দিয়ে চেয়ে দেখি, কর্ভাস তার ঠোঁট দিয়ে হাততালির সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেবিলের উপর ঠুকে চলেছে।

ডিমন্‌সট্রেশনের সময় অবিশ্যি কর্ভাসের কোনও বিরাম ছিল না। গত দু' মাসে সে যা কিছু শিখেছে সবই সম্মেলনের অভ্যাগতদের সামনে উপস্থিত করে তাঁদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে পাখির মস্তিষ্কে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি যে

www.BDeBooks.Com

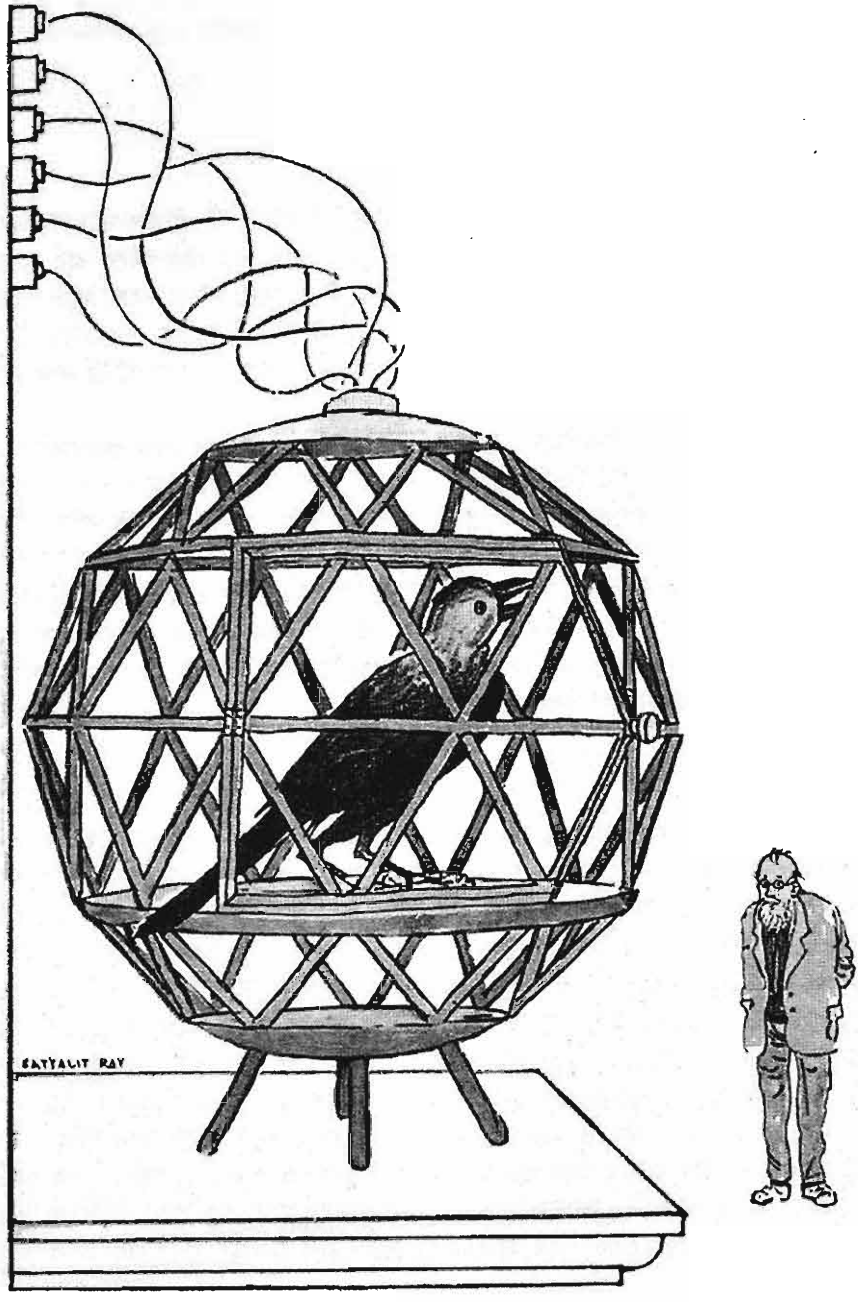

এভাবে প্রবেশ করতে পারে, তা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানকার কাগজ 'কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগো'-র সান্ধ্য সংস্করণে এর মধ্যেই কর্ভাসের খবর বেরিয়ে গেছে। শুধু বেরিয়েছে নয়, প্রথম পাতায় প্রধান খবর হিসেবে বেরিয়েছে, আর তার সঙ্গে বেরিয়েছে পেনসিল মুখে কর্ভাসের একটা ছবি।

মিটিং-এর পর গ্রেনফেল ও সম্মেলনের চেয়ারম্যান সিনিয়র কোভারুবিয়াসের সঙ্গে সানতিয়াগো শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। জনবহুল মনোরম আধুনিক শহর, পুব দিকে আন্ডিজ পর্বতশ্রেণী চিলি ও আরজেনটিনার মধ্যে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক ঘোরার পর কোভারুবিয়াস বললেন, 'সম্মেলনের প্রোগ্রামে দেখে থাকবে, অতিথিদের জন্য আমরা নানা রকম আমোদপ্রমোদের আয়োজন করেছি। তারমধ্যে আজ বিকেলের ব্যাপারটায় আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি। একটি চিলিয়ান জাদুকর আজ তামাশা দেখাবেন তোমাদের খাতিরে। ইনি আর্গাস নামে পরিচিত। এঁর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, ইনি ম্যাজিকে নানা রকম পাখি ব্যবহার করেন।'

ব্যাপারটা শুনে কৌতূহল হয়েছিল, তাই আমি আর গ্রেনফেল আজ বিকেলে এখানকার প্লাজা থিয়েটারে আর্গাসের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম। লোকটা নানা রকম পাখি ব্যবহার করে, সেটা ঠিকই। হাঁস, কাকাতুয়া, পায়রা, মোরগ, তিন হাত লম্বা সারস, এক ঝাঁক হামিং বার্ড— এ সবই কাজে লাগায় আর্গাস এবং বোঝাই যায় যে, সব ক'টি পাখিকেই সে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ শিখিয়ে নিয়েছে। বলাবাহুল্য, এই কাজের কোনওটাই আমার কর্ভাসের কৃতিত্বের ধারেকাছেও আসে না। সত্যি বলতে কী, পাখির চেয়ে আমার অনেক বেশি ইনটারেস্টিং মনে হল জাদুকর ব্যক্তিটিকে। টিয়াপাখির মতো নাক, মাঝখানে সিঁথি করা, টান করে পিছনে আঁচড়ানো নতুন গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো চকচকে চুল, চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা, তার কাচ এত পুরু যে, মণি দুটোকে তীক্ষ্ণ বিন্দুর মতো দেখায়। লম্বায় লোকটা ছ' ফুটের উপর। চকচকে কালো কোটের আস্তিনের ভিতর থেকে দুটো শীর্ণ ফ্যাকাশে হাত বেরিয়ে আছে, সেই হাতের বিভিন্ন ভঙ্গিমাই দর্শকদের সম্মোহিত করে রাখে। জাদু খুব উঁচু দরের না হলেও, জাদুকরের চেহারা ও হাবভাব দেখেই প্রায় পয়সা উঠে আসে। আমি শো দেখে হল থেকে বেরোবার সময় গ্রেনফেলকে পরিহাসচ্ছলে বললাম, 'আমাদের যেমন আর্গাসের ম্যাজিক দেখানো হল, আর্গাসকে তেমনই কর্ভাসের খেলা দেখাতে পারলে মন্দ হত না।'

রাত ন'টায় ডিনার ও তারপরে অতি উপাদেয় চিলিয়ান কফি খেয়ে গ্রেনফেলের সঙ্গে হোটেলের বাগানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সবেমাত্র ঘরে এসে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমি একটু অবাক হয়ে অন্ধকারেই রিসিভারটা তুলে কানে দিলাম।

'সিনিয়ার শঙ্কু ?'

'হ্যাঁ—'

'আমি রিসেপ্‌শন থেকে বলছি। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। একটি ভদ্রলোক বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

আমি বাধ্য হয়েই বললাম যে আমি ক্লান্ত, সুতরাং ভদ্রলোক যদি কাল সকালে আমাকে টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন, তা হলে ভাল হয়। নিশ্চয়ই কোনও রিপোর্টার হবে। এরমধ্যেই চারজন সাংবাদিককে ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে এবং তারা যে সব প্রশ্ন করেছে, তাতে আমার মতো ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষকেও রীতিমতো অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে হয়। একজন সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, ভারতবর্ষে যেমন গোরুকে পুজো করা হয়, তেমনই

www.BDeBooks.Com

কাককেও হয় কি না।

রিসেপ্‌শন লোকটির সঙ্গে কথা বলে বলল, 'সিনিয়র শঙ্কু, ভদ্রলোক বলছেন তিনি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেবেন না। সকালে ওঁর একটা অন্য এন্‌গেজমেন্ট রয়েছে।'

বললাম, 'যিনি এসেছেন তিনি কি সংবাদপত্রের লোক ?'

'আজ্ঞে, না। ইনি হলেন বিখ্যাত চিলিয়ান জাদুকর আর্গাস।'

নামটা শুনে বাধ্য হয়েই ভদ্রলোককে উপরে আসতে বলতে হল। বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম। তিন মিনিট পরে কলিং বেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে যাঁকে সামনে দেখলাম, তাঁকে স্টেজে ছ' ফুট বলে মনে হয়েছিল, এখন বুঝলাম তিনি সাড়ে ছ' ফুটেরও বেশি লম্বা। সত্যি বলতে কী, এত লম্বা মানুষ এর আগে আমি কখনও দেখিনি। বিলিতি কায়দায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নমস্কার জানাবার সময়ও তিনি আমার চেয়ে প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা রয়ে গেলেন। ভদ্রলোককে ঘরে আসতে বললাম। স্টেজের পোশাক ছেড়ে জাদুকর এখন সাধারণ সুট পরে এসেছেন, তবে এ সুটের রংও কালো। ঘরে ঢোকার পর লক্ষ করলাম, কোটের পকেটে 'কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগো'-র সান্ধ্য সংস্করণ। আর্গাস চেয়ারে বসার পর তাঁর ম্যাজিকের তারিফ করে বললাম, 'যত দূর মনে পড়ছে, গ্রিক উপকথায় আর্গাস নামক একজন কীর্তিমান পুরুষের কথা পড়েছি, যার সর্বাঙ্গে ছিল সহস্র চোখ। একজন জাদুকরের পক্ষে নামটা বেশ মানানসই।'

আর্গাস মৃদু হেসে বললেন, 'সেই কীর্তিমান পুরুষটির সঙ্গে পাখির একটা সম্পর্ক রয়েছে, মনে পড়ছে নিশ্চয়ই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। গ্রিক দেবী হেরা আর্গাসের চোখগুলি তুলে ময়ূরের পুচ্ছে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই ময়ূরের লেজে চাকা চাকা দাগ। কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে আপনার চোখ সম্পর্কে। কত পাওয়ার আপনার চশমার ?'

'মাইনাস কুড়ি। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আমার পাখিগুলোর কোনওটারই চশমার প্রয়োজন হয় না।'

নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাস্য করে উঠলেন আর্গাস। কিন্তু সে হাসি ফুরোবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎ মুখ-হাঁ অবস্থাতেই থেকে গেলেন। তাঁর চোখ চলে গেছে আমার ঘরের তাকে রাখা প্লাস্টিকের খাঁচাটার দিকে। কর্ভাস ঘুমিয়ে পড়েছিল ; এখন দেখছি জাদুকরের অট্টহাসিতেই বোধ হয় তার ঘুমটা ভেঙে গেছে। সে দিব্যি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে আগন্তুকটির দিকে।

আর্গাস মুখ-হাঁ অবস্থাতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর মিনিটখানেক ধরে কর্ভাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যার কাগজে এর বিষয় পড়ে অবধি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। আপনার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি পক্ষিবিজ্ঞানী নই, কিন্তু আমিও পাখিদের শিক্ষা দিয়ে থাকি।'

ভদ্রলোক চিন্তিতভাবে ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, 'বেশ বুঝতে পারছি আপনি ক্লান্ত, কিন্তু তাও অনুরোধ করছি— যদি আপনার এই পাখিটিকে একবার খাঁচা থেকে বার করতে পারেন... একবার যদি ওর বুদ্ধির একটু নমুনা...'

আমি বললাম, 'শুধু আমিই ক্লান্ত নই, আমার পাখিও ক্লান্ত। আমার খাঁচার দরজা খুলে দিচ্ছি। বাকিটা নির্ভর করবে আমার পাখির মেজাজের উপর। আমি ওকে জোর করে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে চাই না।'

'বেশ তো—তাই হোক...

খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। কর্ভাস বেরিয়ে এসে ডানার তিন ঝাপটায় আমার খাটের

পাশে টেবিলটায় এসে ঠোঁটের এক অব্যর্থ ঠোকরে ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিল।

ঘর এখন অন্ধকার। জানালা দিয়ে রাস্তার উলটো দিকে হোটেল মেট্রোপোলের জ্বলা-নেবা সবুজ নিয়নের ফিকে আলো ঘরে প্রবেশ করছে। আমি চুপ। কর্ভাস ডানা ঝটপটিয়ে ফিরে গিয়ে খাঁচায় ঢুকে ঠোঁট দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিল।

আর্গাসের মুখের উপর সবুজ আলো নিয়নের তালে তালে জ্বলছে, নিবছে। তার সোনার চশমার পুরু কাচের ভিতর সাপের মতো চোখ সবুজ আলোয় আরও বেশি সাপের মতো মনে হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি সে অবাক, হতভম্ব। বেশ বুঝতে পারছি, কর্ভাস ঘরের বাতি নিবিয়ে তার মনের যে ভাবটা প্রকাশ করল, সেটা আর্গাসের বুঝতে বাকি নেই। কর্ভাস এখন বিশ্রাম চাইছে। সে চায় না ঘরে আলো জ্বলে। সে অন্ধকার চায়, অন্ধকারে ঘুমোতে চায়।

আর আর্গাস ? তার সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা ফিসফিসে শব্দ উচ্চারিত হল—'ম্যানিফিকো !'—অর্থাৎ চমকপ্রদ, অসামান্য। সে তার হাতদুটো যেন তালির ভঙ্গিতে থুতনির সামনে এনে জড়ো করেছে। লক্ষ করলাম, তার নখগুলো অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও চকচকে। বুঝলাম, সে নখে নেলপালিশ মেখেছে। রুপোলি পালিশ। তার ফলে মঞ্চের স্পষ্ট লাইটে আঙুলের খেলা জমে ভাল। সেই রুপোলি নখে এখন বার বার বাইরের সবুজ নিয়নের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

'আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো !'

ফিসফিসে শুকনো গলায় ইংরিজিতে আর্গাসের কথা এল। এতক্ষণ সে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল আমার সঙ্গে। কথাগুলো লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি, তাতে একটা নগ্ন নির্লজ্জ লোভের ইঙ্গিত এসে পড়ছে, কিন্তু আসলে আর্গাসের কণ্ঠস্বরে ছিল অনুনয়।

'আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো !'— আবার বলল আর্গাস।

আমি চুপ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম। এখন কিছু বলার দরকার নেই। আরও কী বলতে চায় লোকটা, দেখা যাক।

আর্গাস এতক্ষণ জানালার দিকে চেয়ে ছিল। এবার সে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ভারী অদ্ভুত লাগছিল এই অন্ধকার আর সবুজ আলোর খেলা। এও যেন একটা ভেলকি। লোকটা এই আছে, এই নেই।

আর্গাসের লম্বা আঙুলগুলো নড়েচড়ে উঠল। সেগুলো এখন তার নিজের দিকে ইঙ্গিত করছে।

'আমাকে দেখো প্রোফেসর। আমি আর্গাস। আমি বিশ্বের সেরা জাদুকর। দুই আমেরিকার প্রতিটি শহরের প্রতিটি জাদুপ্রিয় লোক আমাকে চেনে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সবাই চেনে। আগামী মাসে আমি পৃথিবী ভ্রমণে বেরোচ্ছি। রোম, মাড্রিড, প্যারিস, লন্ডন, অ্যাথেন্স, স্টকহোল্ম, টোকিও, হংকং...। আমার ক্ষমতা এবার স্বীকৃত হবে সারা বিশ্বে। কিন্তু আমার চমকপ্রদ ম্যাজিক আরও সহস্র গুণে বেশি চমকপ্রদ হবে— কীসে জান ? ইফ আই গেট দ্যাট ক্রো— দ্যাট ইন্ডিয়ান ক্রো ! ওই পাখি আমার চাই প্রোফেসর— ওই পাখি আমার চাই...আমার চাই...আমার চাই...'

আর্গাস তার ফিসফিসে কথার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা আমার চোখের সামনে নাড়ছে, আঙুলগুলোকে সাপের ফণার মতো দোলাচ্ছে, নখগুলো সবুজ আলোয় চকচক করছে। আমি মনে মনে হাসলাম। আমার জায়গায় অন্য যে কোনও লোক হলে আর্গাসের কার্যসিদ্ধি হত। অর্থাৎ সে লোক হিপ্নোটাইজড হত, সেই সুযোগে খাঁচার পাখিও আর্গাসের হস্তগত হত। আমাকে হিপ্নোটাইজ করা যে সহজ নয় সেটা এবার আমার কথা থেকেই বোধ হয়

www.BDeBooks.Com

জাদুকর বুঝতে পারল।

'মিষ্টার আর্গাস, আপনি বৃথা বাক্য ব্যয় করছেন। আর আমাকে সম্মোহিত করার চেষ্টাও বৃথা। আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ভাস শুধু আমার ছাত্রই নয়, সে আমার সন্তানের মতো, সে আমার বন্ধু, আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার—'

'প্রোফেসর!'—আর্গাসের কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক তীব্র। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার গলা নামিয়ে বলে চলল, 'প্রোফেসর, তুমি কি জান যে আমি ক্রোড়পতি? শহরের পূর্ব প্রান্তে আমার একটা পঞ্চাশ কামরাবিশিষ্ট প্রাসাদ রয়েছে, সেটা কি তুমি জান? আমার বাড়িতে ছাব্বিশজন চাকর, আমার চারটে ক্যাডিলাক গাড়ি— এ সব কি তুমি জান? খরচের তোয়াক্কা আমি করি না, প্রোফেসর। ওই পাখির জন্য তোমাকে আমি আজই, এক্ষুনি দশ হাজার এস্‌কুডো দিতে রাজি আছি।'

দশ হাজার এস্‌কুডো মানে প্রায় পনেরো হাজার টাকা। আর্গাস জানে না যে, সে যেমন খরচের তোয়াক্কা করে না, আমি তেমনই টাকা জিনিসটারই তোয়াক্কা করি না। সে কথাটা তাকে বললাম। আর্গাস এবার একটা শেষ চেষ্টা করল।

'তুমি তো ভারতীয়। তুমি কি অলৌকিক যোগাযোগে বিশ্বাস কর না? ভেবে দেখো—আর্গাস—কর্ভাস! ওই কাকের নামকরণ হয়েছে আমারই জন্য, সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না, প্রোফেসর?'

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললাম, 'মিস্টার আর্গাস—তোমার গাড়ি বাড়ি খ্যাতি অর্থ নিয়ে তুমি থাকো, কর্ভাস আমার কাছেই থাকবে। ওর শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি। ওকে নিয়ে আমার এখনও অনেক আজ বাকি। আমি আজ ক্লান্ত। তুমি পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিলে, আমি বিশ মিনিট দিয়েছি, আর দিতে পারছি না। আমি এখন ঘুমোব। আমার পাখিও ঘুমোবে। সুতরাং গুড নাইট।'

আমার কথাগুলো শুনে আর্গাসের মুখে হতাশার ছাপ দেখে একটা সামান্য অনুকম্পার ভাব মনে প্রবেশ করলেও আমি সেটাকে একেবারেই আমল দিলাম না। আর্গাস আবার বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে স্প্যানিশ ভাষায় 'গুড নাইট' জানিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি কর্ভাস এখনও জেগে আছে। আমি যেতেই সে ঠোঁট ফাঁক করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল 'কে' এবং শব্দটাতে যে একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে, সেটা তার বলার সুরেই স্পষ্ট।

বললাম, 'এক পাগলা জাদুকর। টাকার গরমটা বড্ড বেশি। তোমাকে চাইতে এসেছিল, আমি না করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো।'

১৬ই নভেম্বর

ভেবেছিলাম কালকের ঘটনা কালকেই লিখে রাখব, কিন্তু বিভীষিকার ঘোর কাটতে সারা রাত লেগে গেল।

কাল সকালটা যেভাবে শুরু হয়েছিল, তাতে বিপদের কোনও পূর্বাভাস ছিল না। সকালে সম্মেলনের বৈঠক ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাপানি পক্ষিবিজ্ঞানী তোমাসাকা মোরিমোতোর ঘোর ক্লান্তিকর ভাষণ। সঙ্গে কর্ভাসকে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতার পর হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে মোরিমোতো আমতা আমতা করছিল, এমন সময় কর্ভাস হঠাৎ আমার চেয়ারের হাতলে সশব্দে ঠোঁটতালি আরম্ভ করে দিল। হলের লোক তাতে হো হো করে হেসে ওঠাতে আমি ভারী অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিলাম।

দুপুরে আমাদের হোটেলেই সম্মেলনের কয়েকজন ডেলিগেটের সঙ্গে লাঞ্চ ছিল। সেখানে যাবার আগে আমি আমার একাত্তর নম্বর ঘরে এসে কর্ভাসকে খাঁচায় রেখে খাবার দিয়ে বললাম, 'তুমি থাকো। আমি খেয়ে আসছি।' বাধ্য কর্ভাস কোনও আপত্তি করল না।

লাঞ্চ শেষ করে যখন ওপরে এসেছি, তখন আড়াইটে। দরজায় চাবি লাগাতেই বুঝলাম, সেটার প্রয়োজন হবে না, কারণ দরজা খোলা। মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম বিপদের আশঙ্কা আমার রক্ত জল করে দিল। ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে দেখি— যা ভেবেছিলাম, তাই। খাঁচা সমেত কর্ভাস উধাও।

আবার ঝড়ের মতো ঘরের বাইরে এলাম। উত্তরদিকে দুটো ঘর পরেই বাঁ দিকে রুমবয়দের ঘর। ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ঘরে গিয়ে দেখি, দুটো রুমবয়ই পাশাপাশি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখের চাহনি দেখেই বুঝতে পারলাম, তাদের দুজনকেই হিপ্‌নোটাইজ করা হয়েছে।

চলে গেলাম একশো সাত নম্বর ঘরে গ্রেনফেলের কাছে। তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে দুজন সটান গিয়ে হাজির হলাম একতলার রিসেপ্‌শনে। রিসেপ্‌শন ক্লার্ক বলল, 'আমাদের কাছ থেকে কেউ আপনার ঘরের চাবি চাইতে আসেনি। ডুপ্লিকেট চাবি রুমবয়দের কাছে থাকে, তারা যদি দিয়ে থাকে।'

রুমবয়দের অবিশ্যি দেওয়ার দরকার হয়নি। আর্গাস তাদের জাদুবলে অকেজো করে দিয়ে নিজেই চাবি নিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে।

শেষটায় হোটেলের দ্বাররক্ষকের কাছে গিয়ে আসল খবর পাওয়া গেল। সে বলল, আধ ঘণ্টা আগে একটা সিল্‌ভার ক্যাডিলাক গাড়িতে আর্গাস এসেছিলেন। তার দশ মিনিট পরে হাতে একটা সেলোফেনের ব্যাগ নিয়ে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে চলে

www.BDeBooks.Com

যান।

রুপোলি রঙের ক্যাডিলাক। কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছে আর্গাস ? তার বাড়িতে কি ? না অন্য কোথাও ?

অবশেষে কোভারুবিয়াসের শরণাপন্ন হতে হল। ভদ্রলোক বললেন, 'আর্গাসের বাড়ি কোথায় সেটা এক্ষুনি জেনে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কী লাভ হবে ? সে কি আর বাড়িতে গেছে ? সে তোমার কর্ভাসকে নিয়ে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। তবে সে যদি শহরের বাইরে বেরোতে যায়, তা হলে একটাই রাস্তা আছে। তোমাদের আমি ভাল গাড়ি, ভাল ড্রাইভার আর সঙ্গে পুলিশ দিতে পারি। সময় কিন্তু খুব কম। আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ো। হাইওয়ে ধরে চলে যাবে। যদি কপালে থাকে তো তার সন্ধান পাবে।'

সোয়া তিনটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রওনা হবার আগে হোটেল থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম যে, আর্গাস (আসল নাম দ্যেমিনগো বার্তেলেমে সারমিয়েন্তো) তার বাড়িতে ফেরেনি। আমাদের সঙ্গে দুজন সশস্ত্র পুলিশ, আমরা পুলিশেরই গাড়িতেই চলেছি। দু'জন পুলিশের একজন— ছোকরা বয়স, নাম কারেরাস— দেখলাম আর্গাস সম্বন্ধে বেশ খবরটবর রাখে। বলল, সানতিয়াগো এবং আশেপাশে আর্গাসের নাকি একাধিক আস্তানা আছে। এককালে জিপসিদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। উনিশ বছর বয়স থেকে ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করেছে। পাখি নিয়ে ম্যাজিক শুরু করেছে বছরচারেক আগে, আর সেই থেকেই ওর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি সত্যিই ক্রোড়পতি ?'

কারেরাস বলল, 'তাই তো মনে হয়। তবে লোকটা ভয়ানক কঞ্জুস, আর কাউকে বিশ্বাস করে না। তাই ওর বন্ধু বলতে এখন আর বিশেষ কেউ নেই।'

শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ে একটা মুশকিল হল। হাইওয়ে দু' ভাগে ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে উত্তরে লস্ আনডিজের দিকে, আর একটা চলে গেছে পশ্চিমে ভালপারাইজো বন্দর পর্যন্ত। দুটো হাইওয়ের মুখের কাছে একটা পেট্রোলের দোকান। দোকানের লোকটাকে জিজ্ঞেস করাতেই সে বলল, 'ক্যাডিলাক ? সিনিয়র আর্গাসের ক্যাডিলাক ? সে তো গেছে ভালপারাইজোর রাস্তায়।'

আমাদের কালো মারসেডিস তিরবেগে রওনা দিল ভালপারাইজোর উদ্দেশে। কর্ভাসের প্রাণহানি হবে না সেটা জানি, কারণ তার প্রতি আর্গাসের লোভটা খাঁটি। কিন্তু কাল রাত্রে কর্ভাসের হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম যে, সে জাদুকর লোকটিকে মোটেই পছন্দ করছে না। সুতরাং আর্গাসের খপ্পরে পড়ে তার যে মনের অবস্থা কী হবে, সেটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

পথে আরও দুটো পেট্রোল স্টেশন পড়ল, এবং দুটোরই মালিকের সঙ্গে কথা বলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে আর্গাসের সিলভার ক্যাডিলাক এই রাস্তা দিয়েই গেছে।

আমি আশাবাদী লোক। নানান সময় নানান সংকট থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছি। আজ পর্যন্ত আমার কোনও অভিযানই ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আমার পাশে বসে গ্রেনফেল ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'ভুলে যেও না, শঙ্কু—তুমি একজন অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছ। তোমার কর্ভাসকে সে যখন একবার হাতে পেয়েছে, তখন সে পাখি তুমি সহজে ফিরে পাবে না এটা জেনে রেখো।'

কারেরাস বলল, 'সিনিয়র আর্গাসের হাতে কিন্তু অস্ত্র থাকার সম্ভাবনা। এককালে তার অনেক ম্যাজিকে তাকে আসল রিভলভার ব্যবহার করতে দেখেছি।'

হাইওয়ে ক্রমে ঢালু নামছে। সানতিয়াগোর ষোলোশো ফুট থেকে এখন আমরা হাজারে

নেমে এসেছি। পিছনে দূরে পর্বতশ্রেণী ক্রমে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে। চল্লিশ মাইল পথ এসেছি, আরও চল্লিশ মাইল গেলে ভালপারাইজো। গ্রেনফেলের ব্যাজার মুখ আমার আশার প্রাচীরে বার বার আঘাত করে তাকে টলিয়ে দিচ্ছে। হাইওয়েতে কিছু না পেলে শহরে গিয়ে পড়তে হবে। তখন আর্গাস-এর অনুসন্ধান আরও সহস্র গুণ বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।

রাস্তা সামনে খানিকটা চড়াই উঠে গেছে। পিছনে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। চড়াই পেরোল। সামনে রাস্তা ঢালু নেমে গেছে বহু দূর। রাস্তার পাশে এখানে ওখানে দু'-একটা গাছ। বহু দূরে একটা গ্রাম। মাঠে মোষের দল। জনমানবের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু সামনে ওটা কী ? এখনও বেশ দূর। সিকি মাইল তো হবেই।

এখন চারশো গজের বেশি নয়। একটা গাড়ি। রোদে ঝলমল করছে। রাস্তার এক পাশে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটা গাছের গুঁড়ি।

এবার কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা।

ক্যাডিলাক গাড়ি। সিলভার ক্যাডিলাক।

আমাদের মারসেডিস তার পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা কেন থেমে আছে, তার কারণটা এবার বুঝলাম। রাস্তার এক পাশে ছটকে গিয়ে সেটা একটা গাছের গুঁড়িতে মেরেছে ধাক্কা। গাড়ির সামনের অংশ গেছে থেঁতলে।

কারেরাস বলল, 'সিনিয়র আর্গাসের গাড়ি। এ ছাড়া আরেকটা সিলভার ক্যাডিলাক আছে সানতিয়াগোতে। ব্যাঙ্কার সিনিয়র গাল্‌দামেসের গাড়ি। কিন্তু এটার নম্বর আমার চেনা।'

গাড়ি তো রয়েছে, কিন্তু আর্গাস কোথায় ?

আর আমার কর্ভাসই বা কোথায় ?

ড্রাইভারের পাশের সিটে ওটা কী ?

জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দেখলাম, সেটা কর্ভাসের খাঁচা। দরজার চাবি আমারই তৈরি, আর সেটা রয়েছে আমারই পকেটে। আজ দুপুরে দরজায় চাবি দিইনি, শুধু ছিটকিনিটাই লাগানো। কভার্স খাঁচা থেকে নিজেই বেরিয়েছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু তার পরে ?

হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল। দূর থেকে। মানুষের গলা।

কারেরাস ও অন্য পুলিশটি বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি। আমাদের ড্রাইভার দেখলাম ভিতু লোক। সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মেরিমাতার নাম জপ করতে শুরু করেছে। গ্রেনফেল ফিসফিস করে বলল, 'ম্যাজিশিয়ান জাতটা আমাকে বড্ড আনকাম্‌ফার্‌টেব্‌ল করে তোলে।' আমি বললাম, 'তুমি বরং আমাদের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বোসো।'

চিৎকারটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তার বাঁ দিক থেকে। কিছু দূরে কতকগুলো ঝোপড়া। দু'-একটা বড় বড় গাছও রয়েছে। সেই দিক থেকেই আসছে চিৎকারটা। কাল রাত্রে ফিসফিসে গলা শুনেছি, তাই চিনতে দেরি হল। এ গলা আর্গাসের। অকথ্য অশ্রাব্য স্প্যানিশে সে গাল দিয়ে চলেছে। কার উদ্দেশে ? ডেভিল বা শয়তানের স্প্যানিশ প্রতিশব্দটা বারকয়েক কানে এল, আর তার সঙ্গে কর্ভাসের নামটা।

'কোথায় গেল সে শয়তান পাখি ? কর্ভাস ! কর্ভাস ! মূর্খ পাখি ! শয়তান পাখি ! নরকবাস আছে তোর কপালে। নরকবাস !'—

আর্গাসের কথা আচমকা থেমে গেল— কারণ সে আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমরাও দেখতে পাচ্ছি তাকে। তার দু' হাতে দুটো রিভলভার। একশো হাত দূরে একটা ঝোপড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

www.BDeBooks.Com

কারেরাস হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'সিনিয়র আর্গাস, তোমার অস্ত্র নামাও ! নইলে—'

একটা কর্ণপটহবিদারক শব্দে আমাদের মারসেডিসের দরজায় একটা রিভলভারের গুলি এসে লাগল। তারপর আরও তিনটে গুলির শব্দ। এ দিকে ও দিকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছটকে বেরিয়ে গেল সেগুলি। কারেরাস দৃপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিনিয়র আর্গাস, আমাদের কাছে বন্দুক রয়েছে। আমরা পুলিশ। আপনি যদি রিভলভার না ফেলে দেন, তবে আমরা আপনাকে জখম করতে বাধ্য হব।'

'জখম ?' আর্গাস শুকনো গলায় আর্তনাদ করে উঠল। 'তোমরা পুলিশ ? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না !'

আর্গাস এখন পঁচিশ হাতের মধ্যে। এইবার বুঝলাম তার দশাটা। তার চশমাটি খোওয়া যাওয়াতে সে প্রায় অন্ধের সামিল হয়ে পড়ে যত্রতত্র গুলি চালিয়েছে।

আর্গাস হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে এল। কারেরাস ও অন্য পুলিশটি তার দিকে এগিয়ে গেল। আমি জানি, এ সংকটে আর্গাসের কোনও ভেলকিই কাজ করবে না। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারেরাস এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে রিভলভার দুটো তুলে নিল। আর্গাস তখন বলছে, 'সে পাখি উধাও হয়ে গেল ! দ্যাট ইন্‌ডিয়ান ক্রো ! শয়তান পাখি...কিন্তু কী অসামান্য তার বুদ্ধি !'

গ্রেনফেল কিছুক্ষণ থেকে ফিসফিস করে কী যেন বলতে চেষ্টা করছিল, এবারে তার কথাটা বুঝতে পারলাম।

'শঙ্কু—দ্যাট বার্ড ইজ হিয়ার।'

কী রকম ? কোথায় কর্ভাস ? আমি তো দেখছি না তাকে !

গ্রেনফেল রাস্তার উলটোদিকে নেড়া অ্যাকেসিয়া গাছটার মাথার দিকে আঙুল দেখাল।

উপরে চেয়ে দেখলাম— সত্যিই তো—আমার বন্ধু, আমার শিষ্য, আমার প্রিয় কর্ভাস গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে নিশ্চিন্তভাবে আমাদের দিকে ঘাড় নিচু করে দেখছে।

তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই সে অক্লেশে গোঁত খাওয়া ঘুড়ির মতো গাছের মাথা থেকে নেমে এসে বসল আমাদের মারসেডিসের ছাদের উপর। তারপর অতি সন্তর্পণে— যেন জিনিসটার মূল্য সে ভালভাবেই জানে— তার ঠোঁট থেকে তার সামনেই নামিয়ে রাখল আর্গাসের মাইনাস বিশ পাওয়ারের সোনার চশমাটা।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৭৯

www.BDeBooks.Com

ডক্টর শেরিং-এর স্মরণশক্তি

২রা জানুয়ারি

আজ সকালটা বড় সুন্দর। চারিদিকে ঝলমলে রোদ, নীল আকাশে সাদা সাদা হৃষ্টপুষ্ট মেঘ, দেখে মনে হয় যেন ভুল করে শরৎ এসে পড়েছে। সদ্য-পাড়া মুরগির ডিম হাতে নিলে যেমন মনটা একটা নির্মল অবাক আনন্দে ভরে যায়, এই আকাশের দিকে চাইলেও ঠিক তেমনই হয়।

আনন্দের অবিশ্যি আরেকটা কারণ ছিল। আজ অনেক দিন পরে বিশ্রাম। আমার যন্ত্রটা আজই সকালে তৈরি হয়ে গেছে। বাগান থেকে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থেকে একটা গভীর প্রশান্তি অনুভব করছি। জিনিসটা বাইরে থেকে দেখতে তেমন কিছুই নয় ; মনে হবে যেন হাল ফ্যাশানের একটা টুপি বা হেলমেট। এই হেলমেটের খোলের ভিতর রয়েছে বাহাত্তর হাজার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারের জটিল স্নায়বিক বিস্তার। সাড়ে তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই যন্ত্র। এটা কী কাজ করে বোঝানোর জন্য একটা সহজ উদাহরণ দিই।

এই কিছুক্ষণ আগেই আমি চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে আমার চাকর প্রহ্লাদ এসেছিল কফি নিয়ে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গত মাসের ৭ই সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিলে ?' প্রহ্লাদ মাথাটাথা চুলকে বলল, 'এজ্ঞে সে তো স্মরণ নাই বাবু !' আমি তখন তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে হেলমেটটা মাথায় পরিয়ে দিয়ে একটা বোতাম টিপতেই প্রহ্লাদের শরীরটা মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠে একেবারে স্থির হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার চোখ দুটো একটা নিষ্পলক দৃষ্টিহীন চেহারা নিল। এবার আমি তাকে আবার প্রশ্নটা করলাম।

'প্রহ্লাদ, গত মাসের সাত তারিখ সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিলে ?'

প্রশ্নটা করতেই প্রহ্লাদের চাহনির কোনও পরিবর্তন হল না ; কেবল তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে জিভটা নড়ে উঠে শুধু একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হল— 'ট্যাংরা'।

টুপি খুলে দেবার পর প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে একগাল হেসে বলল, 'মনে পড়েছে বাবু— ট্যাংরা !'

এইভাবে শুধু প্রহ্লাদ কেন, যে কোনও লোকেরই যে কোনও হারানো স্মৃতিকে এ যন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারে। একজন সাধারণ লোকের মাথায় নাকি প্রায় ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০— অর্থাৎ এক কোটি কোটি—স্মৃতি জমা থাকে, তার কোনওটা স্পষ্ট কোনওটা আবছা। তার মধ্যে দৃশ্য, ঘটনা, নাম, চেহারা, স্বাদ, গন্ধ, গান, গল্প, অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য—সব কিছুই থাকে। সাধারণ লোকের দু' বছর বয়সের আগের স্মৃতি খুব অল্প বয়সেই মন থেকে মুছে যায়। আমার নিজের স্মরণশক্তি অবিশ্যি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। আমার এগারো মাস বয়সের ঘটনাও কিছু মনে আছে। অবিশ্যি কয়েকটা খুব ছেলেবেলার স্মৃতি আমার মনেও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। যেমন এক বছর তিন মাস বয়সে একবার এখানকার সে যুগের ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাকওয়েল সাহেবকে ছড়ি হাতে কুকুর

নিয়ে উশ্রীর ধারে বেড়াতে দেখেছিলাম। কুকুরটার রং ছিল সাদা, কিন্তু জাতটা মনে ছিল না। আজ যন্ত্রটা মাথায় দিয়ে দৃশ্যটা মনে করতেই তৎক্ষণাৎ কুকুরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে জানিয়ে দিল সেটা ছিল বুল টেরিয়ার।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি রিমেমব্রেন। অর্থাৎ ব্রেন বা মস্তিষ্ককে যে যন্ত্র রিমেমবার বা স্মরণ করতে সাহায্য করে। কালই এটার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি ইংল্যান্ডের নেচার পত্রিকায়। দেখা যাক কী হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

আমার লেখাটা নেচারে বেরিয়েছে, আর বেরোনোর পর থেকেই অজস্র চিঠি পাচ্ছি। ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া জাপান সব জায়গা থেকেই যন্ত্রটা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ৭ই মে ব্রাসেল্‌স শহরে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন আছে সেখানে যন্ত্রটা ডিমন্‌স্ট্রেট করার জন্য অনুরোধ এসেছে। এমন একটা যন্ত্র যে হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না, যদিও আমার ক্ষমতার কথা এরা অনেকেই জানে। আসলে হয়েছে কী, স্মৃতির গূঢ় রহস্যটা এখনও বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। আমি নিজেও শুধু এইটুকুই বুঝতে পেরেছি যে কোনও একটা তথ্য মাথার মধ্যে ঢুকলেই সেটা সেখানে স্মৃতি হিসাবে নিজের জন্য খানিকটা জায়গা করে নেয়। আমার বিশ্বাস, এক একটি স্মৃতি হল এক একটি পরমাণুসদৃশ রাসায়নিক পদার্থ, এবং প্রত্যেক স্মৃতিরই একটি করে আলাদা রাসায়নিক চেহারা ও ফরমুলা আছে। যত দিন যায়, স্মৃতি তত ঝাপসা হয়ে আসে, কারণ কোনও পদার্থই চিরকাল এক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমার যন্ত্র মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করে স্মৃতি নামক পদার্থটিকে তাজা করে তুলে পুরনো কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনেকে প্রশ্ন করবে, স্মৃতির রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ না করেও আমি কী করে এমন যন্ত্র তৈরি করলাম। উত্তরে বলব যে, আজকের দিনে আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে যতটা জানি, আজ থেকে একশো বছর আগে তার সিকি ভাগও জানা ছিল না, অথচ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আশ্চর্য আশ্চর্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই তৈরি হয়েছে আমার রিমেমব্রেন যন্ত্র।

নেচারে লেখাটা বেরোবার ফলে একটা চিঠি পেয়েছি, যেটা আমার ভারী মজার লাগল। আমেরিকার ক্রোড়পতি শিল্পপতি হিরাম হোরেনস্টাইন জানিয়েছেন যে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসে দেখছেন যে তাঁর সাতাশ বছর বয়সের আগের ঘটনাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে না। আমার যন্ত্র ব্যবহার করে এই সময়কার ঘটনাগুলো মনে করতে পারলে তিনি আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন। শৌখিন মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের শখ মেটানোর জন্য আমি এ যন্ত্র তৈরি করিনি— এই কথাটাই তাঁকে আমি একটু নরম ভাষায় লিখে জানিয়ে দিয়েছি।

৪ঠা মার্চ

আজ খবরের কাগজে সুইটজারল্যান্ডের একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্টের কথা পড়ে মনটা ভার হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে বিষয়ে একটা দীর্ঘ টেলিগ্রাম এসে হাজির। একেই বোধ হয় বলে টেলিপ্যাথি। খবরটা হচ্ছে এই— একটা গাড়িতে দু'জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক— সুইটজারল্যান্ডের অটো লুবিন ও অস্ট্রিয়ার ডক্টর হিয়েরোনিমাস শেরিং—অস্ট্রিয়ার লান্ডেক শহর থেকে সুইটজারল্যান্ডের ওয়ালেনস্টাট শহরে আসছিলেন। এই দুই বৈজ্ঞানিক কিছু দিন

www.BDeBooks.Com

থেকে কোনও একটা গোপনীয় বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে সামনে ছিল ড্রাইভার, পিছনে লুবিন আর শেরিং। পাহাড়ের পথ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ি খাদে পড়ে। নিকটবর্তী গ্রামের এক মেষপালক চূর্ণবিচূর্ণ গাড়িটিকে দেখতে পায় রাস্তা থেকে হাজার ফুট নীচে। গাড়ির কাছাকাছি ছিল লুবিনের হাড়গোড় ভাঙা মৃতদেহ। আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন ডক্টর শেরিং। রাস্তা থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট নীচে একটি ঝোপে আটকে যায় তাঁর দেহ। দুর্ঘটনার খবর ওয়ালেনস্টাটে পৌঁছানো মাত্র সুইস বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। লুবিন ও শেরিং বুশের কাছেই যাচ্ছিলেন কিছু দিনের বিশ্রামের জন্য। বুশ তাঁর সুপ্রশস্ত মার্সেডিস গাড়িতে শেরিংকে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। এইটুকু খবর কাগজে বেরিয়েছে। বাকিটা জেনেছি বুশের টেলিগ্রামে। এখানে বলে রাখি যে বুশকে আমি চিনি আজ দশ বছর থেকে ; ফ্লোরেন্সে এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। বুশ লিখেছে— যদিও শেরিং-এর দেহে প্রায় কোনও জখমের চিহ্ন নেই, তার মাথায় চোট লাগার ফলে তার মন থেকে স্মৃতি জিনিসটাই নাকি বেমালুম লোপ পেয়ে গেছে। আরও একটা খবর এই যে, গাড়ির ড্রাইভার নাকি উধাও এবং সেই সঙ্গে গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র। শেরিং-এর স্মৃতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ডাক্তার, মনস্তাত্ত্বিক, হিপ্‌নটিস্ট ইত্যাদির চেষ্টা নাকি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বুশ আমাকে পত্রপাঠ আমার যন্ত্রসমেত ওয়ালেনস্টাট চলে যেতে বলেছে। খরচপত্র সেই দেবে। টেলিগ্রামের শেষে সে বলছে— 'ডঃ শেরিং একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি। তাঁকে পুনর্জীবন দান করতে পারলে বিজ্ঞানীমহল তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কী স্থির কর সত্বর জানাও।'

আমার যন্ত্রের দৌড় কত দূর সেটা দেখার এবং দেখাবার এমন সুযোগ আর আসবে না। ওয়ালেনস্টাট যাবার তোড়জোড় আজ থেকেই করতে হবে। আমার যন্ত্র ষোলো আনা পোর্টেবল। এর ওজন মাত্র আট কিলো। প্লেনে অতিরিক্ত ভাড়া দেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

৮ই মার্চ

আজ সকালে জুরিখে পৌঁছে সেখান থেকে বুশের মোটরে করে মনোরম পাহাড়ি পথ দিয়ে ৬০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট ওয়ালেনস্টাট শহরে এসে পৌঁছোলাম পৌনে নটায়। একটু পরেই প্রাতরাশের ডাক পড়বে। আমি আমার ঘরে বসে এই ফাঁকে ডায়রি লিখে রাখছি। গাছপালা ফুলেফলে ভরা ছবির মতো সুন্দর পরিবেশের মধ্যে চোদ্দো একর জমির উপরে বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশের বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের মেঝে, কাঠের দেয়াল। আমি দোতলায় পশ্চিমের একটা ঘরে রয়েছি, ঘরের জানালা খুললেই পাহাড়ে ঘেরা ওয়ালেন লেক দেখা যায়। আমার যন্ত্রটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে খাটের পাশেই একটা টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। আতিথেয়তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না। এইমাত্র বুশের তিন বছরের ছেলে উইলি আমাকে এক প্যাকেট চকোলেট দিয়ে গেল। ছেলেটি ভারী মিষ্টি ও মিশুকে— আপন মনে ঘুরে ঘুরে সুর করে ছড়া কেটে বেড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে সকলকে অভিবাদন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমার দিকে এগিয়ে এসে একটা কালো চুরুটের কেস সামনে ধরে বলল, 'সিগার খাবে ?' আমি ধূমপান করি না, কিন্তু উইলিকে নিরাশ করতে ইচ্ছে করল না, তাই ধন্যবাদ দিয়ে একটা চুরুট বার করে নিলাম। খেলে অবিশ্যি এ রকম চুরুটই খেতে হয় ; অতি উৎকৃষ্ট ডাচ সিগার।

এ বাড়িতে সবসুদ্ধ রয়েছে ছ' জন লোক— বুশ, তার স্ত্রী ক্লারা, শ্রীমান উইলি, বুশের বন্ধু

স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক অমায়িক স্বল্পভাষী হান্‌স উলরিখ, ডঃ শেরিং ও তাঁর পরিচারিকা—নাম বোধহয় মারিয়া। এ ছাড়া দু'জন পুলিশের লোক বাড়িটাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে।

শেরিং রয়েছে পুব দিকের একটা ঘরে। আমাদের দু'জনের ঘরের মধ্যে রয়েছে ল্যান্ডিং ও একতলায় যাবার সিঁড়ি। আমি অবিশ্যি এসেই শেরিংকে একবার চাক্ষুষ দেখে এসেছি। মাঝারি হাইটের মানুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, মাথার সোনালি চুলের পিছন দিকে টাক পড়ে গেছে। মুখটা চৌকো ও গোলের মাঝামাঝি। তাকে যখন দেখলাম, তখন সে জানালার ধারের একটা চেয়ারে বসে হাতে একটা কাঠের পুতুল নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। আমি ঘরে ঢুকতে সে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না। বুঝলাম, ঘরে লোক ঢুকলে উঠে দাঁড়ানোর সাধারণ সাহেবি কেতাটাও সে ভুলে গেছে। চোখের চাহনি দেখে কী রকম খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি চশমা পর ?'

www.BDeBooks.Com

শেরিং-এর বাঁ হাতটা আপনা থেকেই চোখের কাছে উঠে এসে আবার নেমে গেল। বুশ বলল, 'চশমাটা ভেঙে গেছে। আর একটা বানাতে দেওয়া হয়েছে।'

শেরিংকে দেখে এসে আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। এ কথা সে কথার পর বুশ সলজ্জভাবে বলল, 'সত্যি বলতে কী, আমি যে তোমার যন্ত্রটা সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত বোধ করছিলাম, তা নয়। কতকটা আমার স্ত্রীর অনুরোধেই তোমাকে আমি টেলিগ্রামটা করি।'

'তোমার স্ত্রীও কি বৈজ্ঞানিক ?' আমি ক্লারার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্নটা করলাম। ক্লারাই হেসে উত্তর দিল—

'একেবারেই না। আমি আমার স্বামীর সেক্রেটারির কাজ করি। আমি চাইছিলাম তুমি আস, কারণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা। তোমার দেশের বিষয়ে অনেক বই পড়েছি আমি, অনেক কিছু জানি।'

বুশের যদি আমার যন্ত্র সম্বন্ধে কোনও সংশয় থেকে থাকে তো সেটা আজকের মধ্যেই কেটে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আজ বিকেলে শেরিং-এর স্মৃতির বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা হবে।

এবার ড্রাইভারের কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। বুশ বলল, 'পুলিশ তদন্ত করছে। দুটি জায়গার একটিতে ড্রাইভার লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা হল দুর্ঘটনার জায়গার সাড়ে চার কিলোমিটার পশ্চিমে— নাম রেমুস, আর একটা হল সাড়ে তিন কিলোমিটার পুবে— নাম শ্লাইন্‌স। দুটো জায়গাতেই অনুসন্ধান চলছে ; তা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে বনবাদাড়েও খোঁজা হচ্ছে।'

'দুর্ঘটনার জায়গাটা এখান থেকে কত দূরে ?'

'পঁচাশি কিলোমিটার। সে ড্রাইভারকে কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতেই হবে, কারণ, ও দিকে রাত্রে বরফ পড়ে। ভয় হয়, তার যদি কোনও শাকরেদ থেকে থাকে এবং ড্রাইভার যদি কাগজপত্রগুলো তাকে চালান করে দিয়ে থাকে।'

৮ই মার্চ, রাত সাড়ে দশটা

ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বাতাসের শনশন শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বুশ আজ আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত। এখন বলা শক্ত, কে আমার বড় ভক্ত—সে, না তার স্ত্রী।

আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা আমার যন্ত্র নিয়ে শেরিং-এর ঘরে উপস্থিত হলাম। সে তখনও সেই চেয়ারে গুম হয়ে বসে আছে। আমরা ঘরে ঢুকতে আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইল। বুশ তাকে অভিবাদন জানিয়ে হালকা রসিকতার সুরে বলল, 'আজ আমরা তোমাকে একটা টুপি পরাব, কেমন ? তোমার কোনও কষ্ট হবে না। তুমি ওই চেয়ারে যেমনভাবে বসে আছ, সেইভাবেই বসে থাকবে।'

'টুপি ? কী রকম টুপি ?' শেরিং তার গম্ভীর অথচ সুরেলা গলায় একটু যেন অসোয়াস্তির সঙ্গেই প্রশ্নটা করল।

'এই যে, দেখো না।'

আমি ব্যাগ থেকে যন্ত্রটা বার করলাম। বুশ সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে শেরিং-এর হাতে দিল। শেরিং সেটাকে সকালের খেলনাটার মতো করেই নেড়েচেড়ে দেখে আমাকে ফেরত দিয়ে দিল।

www.BDeBooks.Com

'এতে ব্যথা লাগবে না তো ? সে দিনের ইঞ্জেকশনে কিন্তু ব্যথা লেগেছিল।'

ব্যথা লাগবে না কথা দেওয়াতে সে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে শরীরটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাত দুটোকে চেয়ারের পাশে নামিয়ে দিল। তার ঘাড়ে একটা জায়গায় ক্ষতের উপরে প্লাস্টার ছাড়া শরীরের অনাবৃত অংশে আর কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন দেখলাম না।

শেরিংকে হেলমেট পরাতে কোনও অসুবিধা হল না। তারপর লাল বোতামটা টিপতেই হেলমেট-সংলগ্ন ব্যাটারিটা চালু হয়ে গেল। শেরিং একটা কাঁপুনি দিয়ে শরীরটাকে কাঠের মতো শক্ত ও অনড় করে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ঘরের ভিতরে এখন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। এক শেরিং ছাড়া প্রত্যেকেরই দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ক্লারা দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে। নার্স খাটের পিছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে শেরিং-এর দিকে চেয়ে আছে। বুশ ও উলরিখ শেরিং-এর চেয়ারের দু' পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। আমি বুশকে মৃদু স্বরে বললাম, 'তুমি প্রশ্ন করতে চাও ? না আমি করব ? তুমি করলেও কাজ হবে কিন্তু।'

'তুমিই শুরু করো।'

আমি ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট টুল নিয়ে শেরিং-এর মুখোমুখি বসলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম—

'তোমার নাম কী ?'

শেরিং-এর ঠোঁট নড়ল। চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় উত্তর এল।

'হিয়েরোনিমাস হাইনরিখ শেরিং।'

'এই প্রথম !'—রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল বুশ—'এই প্রথম নিজের নাম বলেছে !'

আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম।

'তোমার পেশা কী ?'

'পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।'

'তোমার জন্ম কোথায় ?'

'অস্ট্রিয়া।'

'কোন শহরে ?'

'ইন্‌স্‌ব্রুক।'

আমি বুশের দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলাম। বুশ মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল—মিলছে। আমি আবার শেরিং-এর দিকে ফিরলাম।

'তোমার বাবার নাম কী ?'

'কার্ল ডিট্রিখ শেরিং।'

'তোমার আর ভাইবোন আছে ?'

'ছোট বোন আছে একটি। বড় ভাই মারা গেছে।'

'কবে মারা গেছে ?'

'প্রথম মহাযুদ্ধে। পয়লা অক্টোবর, উনিশশো সতেরো।'

আমি প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে বিস্ময়মুগ্ধ বুশের দিকে চেয়ে তার মৃদু মৃদু মাথা নাড়া থেকে বুঝে নিচ্ছি, শেরিং-এর উত্তরগুলো সব মিলে যাচ্ছে।

'তুমি লান্ডেক গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে ?'

'প্রোফেসর লুবিনের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'কী কাজ ?'

'গবেষণা।'

'কী বিষয় ?'

'বি-এক্স থ্রি সেভন সেভন।'

বুশ ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, এটা হচ্ছে গবেষণাটির সাংকেতিক নাম। আমি প্রশ্নে চলে গেলাম।

'সেই গবেষণার কাজ কি শেষ হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'সফল হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'গবেষণার বিষয়টা কী ছিল ?'

'আমরা একটা নতুন ধরনের আণবিক মারণাস্ত্র তৈরি করার ফরমুলা বার করেছিলাম।'

'কাজ শেষ করে তোমরা ওয়ালেনস্টাট আসছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে গবেষণার কাগজপত্র ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ফরমুলাও ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিল ?'

বুশ আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি জানি কেন। কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি, শেরিং-এর মধ্যে একটা চাপা উশখুশে ভাব। একবার জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটল। একবার যেন চোখের পাতা পড়ো পড়ো হল। কপালের শিরাগুলোও যেন ফুলে উঠেছে।

'আমি...আমি...'

শেরিং-এর কথা বন্ধ হয়ে গেল। তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। আমার বিশ্বাস, গোপনীয় গবেষণার বিষয়টা প্রকাশ করে ফেলে ওর মধ্যে একটা উদ্বেগের ভাব জেগে উঠেছে।

আমি সবুজ বোতাম টিপে ব্যাটারি বন্ধ করে দিলাম। এই অবস্থায় আর প্রশ্ন করা উচিত হবে না। বাকিটা কাল হবে।

হেলমেট খুলে নিতেই শেরিং-এর মাথা পিছনে হেলে পড়ল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে পরমুহূর্তেই আবার চোখ খুলে এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'চুরুট...একটা চুরুট...'

আমি শেরিং-এর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলাম। বুশ যেন অপ্রস্তুত। গলা খাকরিয়ে বলল, 'চুরুট তো নেই। এ-বাড়িতে কেউ চুরুট খায় না। সিগারেট খাবে ?'

উলরিখ তার পকেট থেকে সিগারেট বার করে এগিয়ে দিয়েছে। শেরিং সিগারেট নিল না।

আমি বললাম, 'তোমার কাছে কি তোমার নিজের কোনও চুরুটের বাক্স ছিল ?'

'হ্যাঁ, ছিল !' বলল শেরিং। সে যেন ক্লান্ত, অস্থির।

'কালো রঙের কেস কি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

www.BDeBooks.Com

'তা হলে সেটা উইলির কাছে আছে। ক্লারা, একবার খোঁজ করে দেখবে কি ?'

ক্লারা তৎক্ষণাৎ তার ছেলের খোঁজে বেরিয়ে গেল।

নার্স শেরিং-এর হাত ধরে তুলে, তাকে খাটে শুইয়ে দিল। বুশ খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল, 'এবার তোমার মনে পড়েছে তো ?'

উত্তরে শেরিং যেন অবাক হয়ে বুশের দিকে চাইল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'কী মনে পড়েছে ?'

শেরিং-এর এই পালটা প্রশ্ন আমার মোটেই ভাল লাগল না। বুশও যেন হতভম্ব। সে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সহজভাবেই বলল, 'তুমি কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিয়েছ।'

'কী প্রশ্ন ? কী প্রশ্ন করেছ আমাকে ?'

এবার আমি গত কয়েক মিনিট ধরে যে প্রশ্নোত্তর চলেছে, তার একটা বিবরণ শেরিংকে দিলাম। শেরিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর তার ডান হাতটা আলতো করে নিজের মাথার উপর রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমার মাথায় কী পরিয়েছিলে ?'

'কেন বলো তো ?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অজস্র পিন ফুটছে।'

'তোমার মাথায় এমনিতেই চোট লেগেছিল। পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় তুমি মাথায় চোট পাও, তার ফলে তোমার পূর্বস্মৃতি লোপ পায়।'

শেরিং বোকার মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কী সব বলছ তুমি। পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ব কেন ?'

আমরা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

ক্লারা ফিরে এসেছে। তার হাতে আমার দেখা চুরুটের কেস। সে সেটা শেরিং-এর হাতে দিয়ে বিনীতভাবে বলল, 'আমার ছেলে কখন যেন এটা নিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিল। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

বুশ আবার গলা খাকরিয়ে বলল, 'তুমি যে চুরুট খাও সে কথাটা মনে পড়েছে নিশ্চয়ই ?'

চুরুটের কেস হাতে নিয়ে শেরিং-এর চোখ বুজে এল। তাকে সত্যিই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম, আমাদের এবার এঘর থেকে চলে যেতে হবে।

রিমেমব্রেন যন্ত্র ব্যাগে পুরে নিয়ে আমরা চারজন এসে বৈঠকখানায় বসলাম। খুশি ও খটকা মেশানো অদ্ভুত একটা অবস্থা আমার মনের। হেলমেটপরা অবস্থায় হারানো স্মৃতি ফিরে এলে হেলমেট খোলার পর সে স্মৃতি আবার হারিয়ে যাবে কেন ? শেরিং-এর মাথায় কি তা হলে খুব বেশিরকম কোনও গণ্ডগোল হয়েছে ?

এদের তিনজনকে কিন্তু ততটা হতাশ মনে হচ্ছে না।

উলরিখ তো যন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল, 'এটা যে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যেখানে স্মৃতির ভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল, সেখানে পর পর এতগুলো প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেওয়া কি সহজ কথা ?'

বুশ বলল, 'আসলে মনের দরজা এমনভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সেটা খুলেও খুলছে না। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে কালকের জন্য অপেক্ষা করা। কাল আবার ওকে টুপি পরাতে হবে। আমাদের দিক থেকে কাজটা হবে শুধু প্রশ্নের উত্তর আদায় করা। অ্যাক্সিডেন্টের আগে গাড়িতে কী ঘটেছিল সেটা জানা দরকার। বাকি কাজ করবে পুলিশে।'

আটটা নাগাদ বুশ একবার পুলিশে টেলিফোন করে খবর দিল। ড্রাইভার হাইন্‌ৎস

নয়মানের কোনও পাত্তা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তা হলে কি বি-এক্স থ্রি সেভন সেভনের ফরমুলা সমেত নয়মানের তুষারসমাধি হল।

৯ই মার্চ

কাল রাত্রে দুটো পর্যন্ত ঘুম আসছে না দেখে শেষটায় আমারই তৈরি সম্‌নোলিনের বড়ি খেয়ে একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা গাঢ় ঘুম হল। আজ সকালে উঠেই আমার যন্ত্রটা একটু নেড়েচেড়ে তাতে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে কি না দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে কাজটা করার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি শেরিং-এর নার্স। ভদ্রমহিলা রীতিমতো উত্তেজিত।

'ডঃ শেরিং তোমাকে ডাকছেন। বিশেষ দরকার।'

'কেমন আছেন তিনি ?'

'খুব ভাল। রাত্রে ভাল ঘুমিয়েছিলেন। মাথার যন্ত্রণাটাও নেই। একেবারে অন্য মানুষ।'

আমি আলখাল্লা পরা অবস্থাতেই শেরিং-এর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে ইংরিজিতে 'গুড মর্নিং' বলল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছ ?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার সমস্ত স্মৃতি ফিরে এসেছে। আশ্চর্য যন্ত্র তোমার। শুধু একটা কথা। কাল তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি আমাদের গবেষণা সম্পর্কে যা বলেছি, সেটা তোমাদের গোপন রাখতে হবে।'

'সে আর তোমাকে বলতে হবে না। আমাদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'আরেকটা কথা। লুবিনের কী হল জানার আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি জানতে চাই সে কোথায়। সেও কি জখম হয়ে পড়ে আছে ?'

'না। লুবিন মারা গেছে।'

'মারা গেছে !'

শেরিং-এর চোখ কপালে উঠে গেল। আমি বললাম, 'তুমি যে বেঁচেছ, সেটাও নেহাতই কপাল জোরে।'

'আর কাগজপত্র ?' শেরিং ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

'কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে কাগজপত্রের সঙ্গে ড্রাইভারও উধাও। এ ব্যাপারে তুমি কোনও আলোকপাত করতে পার কি ?'

শেরিং ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'তা পারি বই কী।'

আমি চেয়ারটা তার খাটের কাছে এগিয়ে নিয়ে বসলাম। এ বাড়ির লোকজনের বোধ হয় এখনও ঘুম ভাঙেনি। তা হোক ; সুযোগ যখন এসেছে, তখন কথা চালিয়ে যাওয়াই উচিত। বললাম, 'বলো তো দেখি, আসল ঘটনাটা কী।'

শেরিং বলল, 'আমরা লান্ডেক শহর থেকে রওনা হয়ে ফিন্‌স্টেরমুন্‌ৎসে সীমানা পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ডে প্রবেশ করে কয়েক কিলোমিটার যেতেই এসে পড়ল শ্লাইন্‌স নামে একটা ছোট্ট শহর। সেখানে গাড়ি মিনিট পনেরোর জন্য থামে। আমরা একটা দোকানে বসে বিয়ার খেয়ে আবার রওনা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই গাড়িতে কী যেন গণ্ডগোল হওয়ায় ড্রাইভার নয়মান গাড়ি থামায়। তারপর নেমে গিয়ে সে বনেট খুলে কী যেন দেখে লুবিনকে ডাক দেয়। লুবিন নেমে নয়মানের দিকে এগিয়ে যেতেই নয়মান তাকে একটা রেঞ্জ দিয়ে

www.BDeBooks.Com

মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে। স্বভাবতই আমিও তখন নামি। কিন্তু নয়মান শক্তিশালী লোক। ধস্তাধস্তিতে আমি হেরে যাই, সে আমারও মাথায় রেঞ্জের বাড়ি মেরে আমায় অজ্ঞান করে। তারপর আর কিছুই মনে নেই।'

আমি বললাম, 'পরের অংশ তো সহজেই অনুমান করা যায়। নয়মান তোমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলে দিয়ে গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে পালায়।'

টেলিফোন বাজার একটা আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই শুনেছিলাম, এখন শুনলাম কাঠের মেঝের উপর দ্রুত পা ফেলার শব্দ। বুশ দৌড়ে ঘরে ঢুকল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় খাদের মধ্যে কিছু কাগজ পাওয়া গেছে। লেখা প্রায় মুছে গেছে, কিন্তু সেটা কী কাগজ, তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না।'

'তা হলে ফরমুলা হারায়নি ?' শেরিং চেঁচিয়ে উঠল।

শেরিং-এর মুখে এ প্রশ্ন শুনে বুশ রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা। আমি তাকে সকালের ব্যাপারটা বলে দিলাম। বুশ বলল, 'তার মানে বুঝতে পারছ তো ?— নয়মান হয়তো ফরমুলা নেয়নি। শুধু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দামি জিনিস নিয়ে পালিয়েছে।'

'সেটা কী করে বলছ তোমরা', শেরিং ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল— 'গবেষণা সংক্রান্ত কাগজ ছাড়া অন্য অদরকারি কাগজও তো ছিল আমাদের সঙ্গে। খাদে যে কাগজ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে তো গবেষণার কোনও সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।'

শেরিং ঠিকই বলেছে। কতগুলো লেখা ধুয়ে যাওয়া কাগজ থেকে এটা মোটেই প্রমাণ হয় না যে নয়মান ফরমুলা নেয়নি। যাই হোক, আমি আর বুশ স্থির করলাম যে, উলরিখকে শেরিং-এর সঙ্গে রেখে আমরা দু'জন ব্রেকফাস্ট সেরেই চলে যাব অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়।

আরও কিছু কাগজ পাওয়া যেতে পারে, এবং তার মধ্যে ফরমুলাটাও থাকতে পারে, এমন একটা ক্ষীণ আশা জেগেছে আমাদের মনে। রেমুস আর শ্লাইন্‌সের মধ্যবর্তী অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা এখান থেকে পঁচাশি কিলোমিটার। খুব বেশি তো সোয়া ঘন্টা লাগবে পৌঁছাতে। আমার মতে ড্রাইভার খোঁজার চেয়েও বেশি জরুরি কাজ হচ্ছে কাগজ খোঁজা। লেখা ধুয়ে মুছে গেলে ক্ষতি নেই। সে লেখা পাঠোদ্ধার করার মতো রাসায়নিক কায়দা আমার জানা আছে।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। আমরা আর মিনিট দশেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কেন জানি না কিছুক্ষণ থেকে আমার মনটা মাঝে মাঝে খচ খচ করে উঠছে। কোথায় যেন ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু সেটা যে কী, সেটা বুঝতে পারছি না।

কেবল একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমার যন্ত্রে কোনও গণ্ডগোল নেই।

১০ই মার্চ, রাত ১২টা

একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঘোর এখনও পুরোপুরি কাটেনি, কাটবে সেই গিরিডিতে আমার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে গিয়ে। এমন ছবির মতো সুন্দর দেশে এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

গতকাল সকালে আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমি, বুশ আর সুইস পুলিশের হান্‌স বার্গার যখন দুর্ঘটনার জায়গায় রওনা হলাম, তখন আমার ঘড়িতে পৌনে ন'টা। রাস্তার এখানে সেখানে বরফ জমে আছে, চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে আর চুড়োয় বরফ। গাড়ির কাচ তোলা থাকলেও গাছপালার অস্থির ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম বেশ জোরে হাওয়া বইছে। বুশই গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশে আমি, পিছনের সিটে বার্গার।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে লাগল এক ঘন্টা দশ মিনিট। রেমুসে একবার মিনিট তিনেকের জন্য থেমেছিলাম। সেখানে পুলিশের লোক ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম নয়মানের কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পুরোদমেই চলেছে, এমনকী নয়মানকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্টের জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তার পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে সাড়ে তিন হাজার ফুট। নীচের দিকে চাইলে একটা সরু নদী দেখতে পাওয়া যায়। মনে মনে বললাম, কাগজপত্র যদি ওই নদীর জলে ভেসে গিয়ে থাকে, তা হলে আর উদ্ধারের কোনও আশা নেই। রাস্তাটা এখানে এত চওড়া যে জোর করে ঠেলে না ফেললে, বা ড্রাইভারের হঠাৎ মাথা বিগড়ে না গেলে, গাড়ি খাদে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের গায়ে পুলিশের লোক দেখতে পেলাম, রাস্তার ওপরেও কিছু জিপ ও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম, খানাতল্লাশির কাজে কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। আমরাও দুজনে পাহাড়ের গা দিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলাম।

পায়েহাঁটা পথ রয়েছে, ঢালও তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। দূর থেকে সুরেলা ঘণ্টার শব্দ পাচ্ছি ; বোধ হয় গোরু চরছে। সুইস গোরুর গলায় বড় বড় ঘন্টা বাঁধা থাকে। তার শব্দ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও মনোরম করে তোলে।

গাড়ি যেখানে পড়েছিল, আর লুবিনের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, এই দুটো জায়গা আগে দেখা দরকার। এ দিকে ও দিকে বরফের শুভ্র কার্পেট বিছানো রয়েছে, মাঝে মাঝে ঝাউ, বিচ আর অ্যাশ গাছের ডাল থেকে ঝুপ ঝুপ করে বরফ মাটিতে খসে পড়ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট খুঁজেও এক টুকরো কাগজও পেলাম না। কিন্তু গাড়ির জায়গা

www.BDeBooks.Com

থেকে আরও প্রায় পাঁচশো ফুট নেমে গিয়ে যে জিনিসটা আবিষ্কার করলাম, সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

আবিষ্কারটা আমারই। সবাই মাটিতে খুঁজছে কাগজের টুকরো ; আমার দৃষ্টি কিন্তু গাছের ডালপাতা ফোকর ইত্যাদিও বাদ দিচ্ছে না। একটা ঘন পাতাওয়ালা ওক গাছের নীচে এসে দৃষ্টি উপরে তুলতেই পাতার ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট সাদা জিনিস চোখে পড়ল যেটা কাগজও নয়, বরফও নয়। আমার দৃষ্টি যে কোনও পুলিশের দৃষ্টির চেয়ে অন্তত দশ গুণ বেশি তীক্ষ্ণ। দেখেই বুঝলাম ওটা একটা কাপড়ের অংশ। বার্গারকে ইশারা করে কাছে ডেকে গাছের দিকে আঙুল দেখালাম। সে সেটা দেখামাত্র আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডাল বেয়ে উপরে উঠে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে চেঁচিয়ে উঠেছে তার মাতৃভাষা জার্মানে—

'ডা ইস্ট আইনে লাইখে !'

অর্থাৎ— এ যে দেখছি একটা মৃতদেহ !

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহ নীচে নেমে এল। বরফের দেশ বলেই মৃত্যুর এত দিন পরেও দেহ প্রায় অবিকৃত রয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ হল ড্রাইভার হাইন্‌ৎস নয়মানের মৃতদেহ। তার কোটের পকেটে রয়েছে তার গাড়ির লাইসেন্স ও তার ব্যক্তিগত আইডেন্টিটি কার্ড। নয়মানেরও হাড়গোড় ভেঙেছে, হাতেমুখে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। সেও যে গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে এসে এই ওক গাছের ডালপালার ভিতরে এত দিন মরে পড়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তা হলে কি নয়মান লুবিন ও শেরিংকে অজ্ঞান করে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলার সময় নিজেই পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল ? নাকি অন্য কোনও অচেনা লোক এসে তার এই দশা করেছে ? যাই হোক না কেন, নয়মানকে খোঁজার জন্য পুলিশকে আর মেহনত করতে হবে না।

এটাও বলে রাখি যে নয়মানের জামার পকেটে গবেষণা সংক্রান্ত কোনও কাগজ পাওয়া যায়নি। সে কাগজ যদি খাদের মধ্যে পাওয়া যায় তো ভাল, না হলে বি-এক্স তিনশো সাতাত্তরের মামলা এখানেই শেষ...

* * *

আমরা এগারোটার সময় ওয়ালেনস্টার্ট রওনা দিলাম। আমাদের দুজনেরই দেহমন অবসন্ন। সেটা কিছুটা পাহাড়ে ওঠানামার পরিশ্রমের জন্য, কিছুটা দুর্ঘটনার কথা মনে করে। সেই সঙ্গে কাল রাত্রের মতো আজও কী কারণে যেন আমার মনের ভিতরটা খচ খচ করছে। কী একটা জিনিস, বা জিনিসের অভাব লক্ষ করে মুহূর্তের জন্য আমার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যেটা আমার স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। সঙ্গে রিমেমব্রেন যন্ত্রটা আছে— ওটা হাতছাড়া করতে মন চায় না— একবার মনে হল যন্ত্রটা পরে বুশকে দিয়ে প্রশ্ন করিয়ে দেখি কী হয়, কিন্তু তারপরেই খেয়াল হল, কী ধরনের প্রশ্ন করলে স্মৃতিটা ফিরে আসবে; সেটাও আমার জানা নেই। অগত্যা চিন্তাটা মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হল।

বাড়ি পৌঁছানোর কিছু আগে থেকেই মেঘ করেছিল, গাড়ি গেটের সামনে থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।

শেরিং নয়মানের মৃতদেহ আবিষ্কারের কথা শুনে আমাদেরই মতো হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, 'দুটি লোকের মৃত্যু, আর তার সঙ্গে সাত বছরের পরিশ্রম পণ্ড।' তারপর একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এক হিসেবে ভালই হয়েছে।'

আমরা একটু অবাক হয়েই শেরিং-এর দিকে চাইলাম। তার দৃষ্টিতে একটা উদাস ভাব দেখা দিয়েছে। সে বলল, 'মারণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। লুবিনই প্রথমে করে প্রস্তাবটা। আমি গোড়ায় আপত্তি করলেও, পরে নিজের অজান্তেই যেন জড়িয়ে পড়ি, কারণ লুবিন ছিল কলেজজীবন থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

শেরিং একটু থেমে আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলল, 'এই যন্ত্রের প্রেরণা কোত্থেকে এসেছিল জান? তুমি ভারতীয়, তাই তোমাকেই বিশেষ করে বলছি। লুবিন সংস্কৃত জানত। বার্লিনের একটি সংগ্রহশালায় রাখা একটি আশ্চর্য সংস্কৃত পুঁথি লুবিন পড়েছিল কিছুকাল আগে। এই পুঁথির নাম সমরাঙ্গনসূত্রম। এতে যে কত রকম যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তার হিসেব নেই। সেই পুঁথি পড়েই লুবিনের মাথায় এই অস্ত্রের পরিকল্পনা আসে। ...যাক গে, যা হয়েছে তাতে হয়তো আখেরে মঙ্গলই হবে।'

আমি সমরাঙ্গনসূত্রমের নাম শুনেছি, কিন্তু সেটা পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। অবিশ্যি ভারতীয়রা যে মারণাস্ত্র নিয়ে এককালে বিশেষভাবে চিন্তা করেছে, সেটা তো মহাভারত পড়লেই বোঝা যায়।

শেরিংকে আর এখানে ধরে রাখার কোনও মানে হয় না। আমরা যখন বেরিয়েছিলাম, সেই সময় সে নাকি আল্‌টডর্ফ শহরে তার এক বন্ধুকে ফোন করে বলেছে তাকে যেন এসে নিয়ে যায়। আল্‌টডর্ফ এখান থেকে পশ্চিমে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে। শেরিং-এর বন্ধু বলেছে বিকেলের দিকে আসবে।

সারা দুপুর আমরা চারজন পুরুষ ও একজন মহিলা বৈঠকখানায় বসে গল্পগুজব করলাম। সাড়ে তিনটের সময় একটা হাল ফ্যাশানের লাল মোটরগাড়ি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। তার থেকে নামলেন একটি বছর চল্লিশেকের স্বাস্থ্যবান পুরুষ, লম্বায় ছ' ফুটের ওপর, পরনে চামড়ার জার্কিন ও কর্ডের প্যান্ট। রোদেপোড়া চেহারা দেখে আন্দাজ করেছিলাম, পরে শুনলাম সত্যিই এঁর পাহাড়ে ওঠার খুব শখ, সুইটজারল্যাণ্ডের উচ্চতম তুষারশৃঙ্গ মন্টে রোজায় চড়েছেন বারপাঁচেক— যদিও পেশা হল ওকালতি। বলা বাহুল্য ইনিই শেরিং-এর বন্ধু, নাম পিটার ফ্রিক্। শেরিং আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আর একবার আমার যন্ত্রটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আল্‌টডর্ফের দিকে রওনা দিয়ে দিল।

সে যাবার মিনিট দশেক পরে— সবেমাত্র ক্লারা সকলের জন্য লেমনটি ও কেক এনে টেবিলে রেখেছে— এমন সময় হঠাৎ ভেলকির মতো আমার মনের সেই অসোয়াস্তির কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল, আর হওয়ামাত্র আমি সবাইকে চমকে দিয়ে তড়াক করে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুশের দিকে ফিরে বললাম, 'এক্ষুনি চলো। আল্‌টডর্ফ যেতে হবে।'

'তার মানে?' উলরিখ আর বুশ একসঙ্গে বলে উঠল।

'মানে পরে হবে। আর এক মুহূর্ত সময় নেই!'

আমার এই বয়সে এই তৎপরতা দেখেই বোধহয় বুশ ও উলরিখ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে তিনটে করে ধাপ উঠতে উঠতে বুশকে বললাম, 'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে? আমারটা আনিনি।'

'একটা লুগার অটোম্যাটিক আছে।'

'ওটা নিয়ে নাও। আর পুলিশের লোকটি থাকলে তাকেও বলে দাও সঙ্গে আসতে। আর আল্‌টডর্ফেও জানিয়ে দাও— সে দিকেও যেন পুলিশ তৈরি থাকে।'

www.BDeBooks.Com

আমার যন্ত্রটাকে ঘর থেকে নিয়ে আমরা চারজন পুরুষ বুশের গাড়িতে উঠে ঝড়ের বেগে ছুটলাম আল্টডর্ফের উদ্দেশে। বুশ মোটর চালনায় সিদ্ধহস্ত— স্টিয়ারিং ধরে এক মিনিটের মধ্যে একশো কুড়ি কিলোমিটার স্পিড তুলে দিল। এ দেশে যারা গাড়ির সামনের সিটে বসে, তাদের প্লেনযাত্রীর মতো কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে হয়। এ গাড়িটা তো এমনভাবে তৈরি যে বেল্ট না বাঁধলে গাড়ি চলেই না। শুধু তাই না— গাড়িতে যদি আচমকা ব্রেক কষা হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ ড্যাশবোর্ডের দুটো খুপরি থেকে দুটো নরম তুলোর মতো জিনিস লাফিয়ে বেরিয়ে এসে চালক ও যাত্রীকে হুমড়ি খেয়ে নাকমুখ থ্যাঁতলানোর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

আমাদের অবিশ্যি আচমকা ব্রেক কষার প্রয়োজন হয়নি। ত্রিশ কিলোমিটারের ফলক পেরোবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা শেরিং-এর লাল গাড়ি দেখতে পেলাম। তার চলার মেজাজে চালকের নিরুদ্বেগ ভাবটা স্পষ্ট। আমি বললাম, 'ওটাকে পেরিয়ে গিয়ে থামো।'

বুশ হর্ন দিতে দিতে লাল গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে খানিক দূর গিয়ে হাত দেখিয়ে গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে ট্যারচা ভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। ফলে শেরিং-এর গাড়ি বাধ্য হয়েই থেমে গেল।

আমরা চারজন গাড়ি থেকে নামলাম। শেরিং আর তার বন্ধুও নেমে অবাক মুখ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

'কী ব্যাপার ?' শেরিং প্রশ্ন করল।

পথে আসার সময় আমাদের চারজনের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। হয়তো আমার গম্ভীরভাব দেখেই অন্য তিনজন সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। কাজেই আমরা কেন যে এই অভিযানে বেরিয়েছি, সেটা একমাত্র আমিই জানি, আর তাই কথাও বলতে হবে আমাকেই।

আমি এগিয়ে গেলাম। শেরিং যতই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করুক না কেন, তার ঠোঁটের ফ্যাকাশে শুকনো ভাবটা সে গোপন করতে পারছে না। তার তিন হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধু পিটার ফ্রিক্।

'একটা চুরুট খেতে ইচ্ছে করল', আমি শান্তভাবে বললাম, 'কাল তোমার ডাচ চুরুট পান করে আমার নেশা হয়ে গেছে। আছে তো চুরুটের কেসটা ?'

আমার এই সহজভাবে বলা সামান্য কয়েকটা কথায় যেন ডিনামাইটে অগ্নি সংযোগ হল। শেরিং-এর বন্ধুর হাতে মুহূর্তের মধ্যে চলে এল একটা রিভলভার, আর সেই মুহূর্তেই সেটা গর্জিয়ে উঠল। আমি অনুভব করলাম আমার ডান কনুই ঘেঁষে গুলিটা গিয়ে লাগল বুশের মার্সেডিস গাড়ির ছাতের একটা কোণে। কিন্তু সে রিভলভার আর এখন পিটার ফ্রিকের হাতে নেই, কারণ দ্বিতীয় আর একটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিকের রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়েছে, আর ফ্রিক্ তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজিটা চেপে মুখ বিকৃত করে হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে পড়েছে।

আর শেরিং ? সে একটা অমানুষিক চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে উলটোমুখে দৌড় লাগাতেই বুশ ও উলরিখ তিরবেগে ছুটে গিয়ে বাঘের মতো লাফিয়ে তাকে বগলদাবা করে ফেলল। আর আমি— জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু— আমার অদ্বিতীয় আবিষ্কার রিমেমব্রেন যন্ত্রটি শেরিং-এর মাথায় পরিয়ে বোতাম টিপে ব্যাটারি চালু করে দিলাম।

শেরিং দুজনের হাতে বন্দি হয়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, তার নিষ্পলক দৃষ্টি দেখে মনে হয়, সে দূরে তুষারাবৃত পাহাড়ের চুড়োর দিকে চেয়ে ধ্যান করছে।

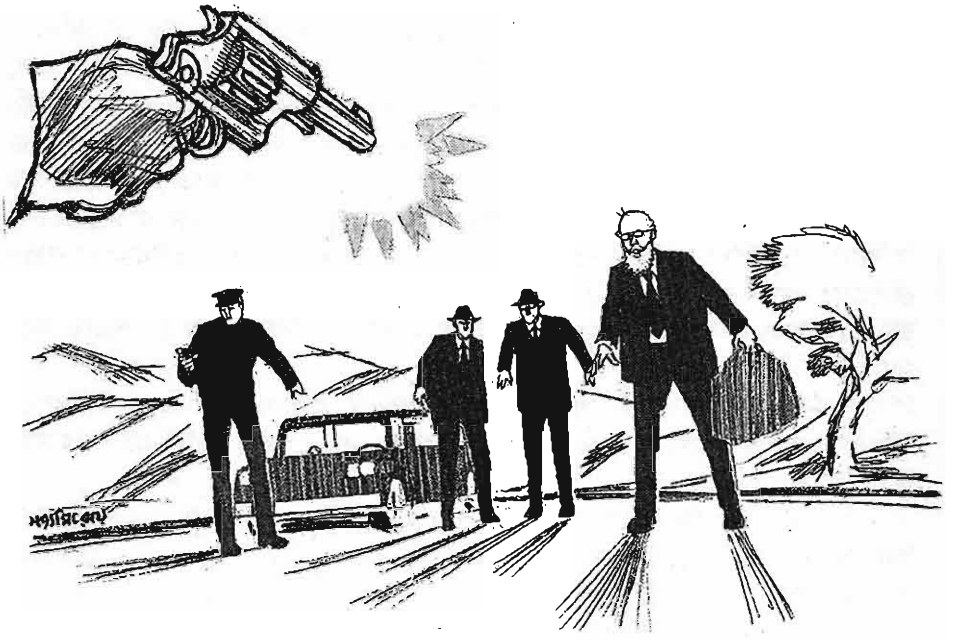

এবার আমার খেলা।

আমি প্রশ্ন করলাম শেরিং-কে উদ্দেশ্য করে।

'ডক্টর লুবিন কীভাবে মরলেন ?'

'দম আটকে।'

'তুমি মেরেছিলে তাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে ?'

'টুঁটি টিপে।'

'তখন গাড়ি চলছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভার নয়মান কীভাবে মরল ?'

'নয়মানের সামনে আয়না ছিল। আয়নায় সে লুবিনের হত্যাদৃশ্য দেখে। সেই সময় তার স্টিয়ারিং ঘুরে যায়। গাড়ি খাদে পড়ে।'

'তার সঙ্গে তুমিও পড় ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি ভেবেছিলে লুবিন ও নয়মানকে খুন করে তাদের খাদে ফেলে দেবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ফরমুলা নিয়ে পালাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে তুমি ওটা দিয়ে ?'

'বিক্রি করতাম।'

www.BDeBooks.Com

'কাকে ?'

'যে বেশি দাম দেবে, তাকে।'

'ফরমুলার কাগজ কি তোমার কাছে আছে ?'

'না।'

'তবে কী আছে ?'

'টেপ।'

'তাতে ফরমুলা রেকর্ড করা আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে সে টেপ ?'

'চুরুটের কেসে।'

'ওটা কি আসলে একটা টেপ রেকর্ডার ?'

'হ্যাঁ।'

আমি শেরিং-এর মাথা থেকে হেলমেট খুলে নিলাম। পুলিশের লোকটি ভিজে রাস্তার উপর জুতোর শব্দ তুলে শেরিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

এখন মনে হচ্ছে কী আশ্চর্য এই মস্তিষ্ক জিনিসটা, আর কী অদ্ভুত এই স্মৃতির খেলা। কাল শেরিং চুরুট চাইল, ক্লারা তাকে কেসটা এনে দিল, কিন্তু সে চুরুট খেল না। তখনই ব্যাপারটা পুরোপুরি আঁচ করা উচিত ছিল, কিন্তু করিনি। আজ সকালেও তার ঘরে চুরুটের কোনও গন্ধ বা কোনও চিহ্ন দেখিনি। চুরুটের কেসটা নিয়মিত খাটের পাশের টেবিলে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তা ছিল না। আজ দুপুরে এতক্ষণ বসে গল্প করলাম, কিন্তু তাও শেরিং চুরুট খেল না।

গান মেটালের তৈরি কেসটা এখন আমার ঘরে আমার টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। এর ঢাকনাটা খুললে বেরোয় চুরুট, আর নীচের দিকে একটা প্রায়-অদৃশ্য বোতাম টিপলে তলাটা খুলে গিয়ে বেরোয় মাইক্রোফোন সমেত একটা খুদে টেপ রেকর্ডার। টেপটা চালিয়ে দেখেছি, তাতে বি-এক্স তিনশো সাতাত্তরের সব তথ্যই রেকর্ড করা আছে শেরিং-এর নিজের গলায়। এরই উপর যদি অন্য কিছু রেকর্ড করা যায়, তা হলে শেরিং-এর এই অপদার্থ ফরমুলাটা চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উইলির গলা না ? সে আবার সুর করে ছড়া কাটছে।

মাইক্রোফোনটা বার করে রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলাম।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮১